বিতর্কিত মুনাজাত
ও একটি নামায
আবদুল হামীদ ফাইযী

আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد

বিদআতের বিরুদ্ধে এ্যান্টি-ভাইরাস ভ্যাকসিন নেওয়া সত্ত্বেও সমাজে বিদআতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যা সুন্নত বলে জ্ঞান ছিল, আজ তা বিদআত বলে জানা যাচ্ছে। ইন্টারনেট ও বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সুবিধা হওয়ার ফলে এবং সেই সাথে প্রবাসী কর্মচারী ও হাজী সাহেবদের মাধ্যমে সারা বিশ্বে সঊদী আরবের সাথে দ্বীনী ব্যাপারে যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার বিপ্লব শুরু হয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

সকলের মনে প্রশ্ন, এটা আমাদের দেশে আছে, এখানে নেই কেন? ওটা আমাদের দেশে নেই, এখানে আছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন জ্ঞানীগণ। উদারপন্থীগণ সঊদী আরবের ফতোয়া মেনে নেন এবং গোঁড়াপন্থীগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত এবং মাগরেবের ফরয নামাযের আগে দুই রাকআত নামাযের মাসআলা দুটিও অনেকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনেক প্রবাসী ও হাজী সাহেবান প্রশ্নের উত্তর জেনে সঊদী আরবের দ্বীনী জ্ঞান-গবেষণা ও সেখানকার মুফতীদেরকে প্রাধান্য দেন। পক্ষান্তরে অন্য অনেকে তা অগ্রাহ্য করেন, তাঁরা তাঁদের ইজতিহাদী-জ্ঞানে কুরআন-হাদীস থেকে দলীল খুঁজে স্বমতকে বলিষ্ঠ করার চেষ্টা করেন। তাঁরা তাহক্বীক্বের যুগে তাহক্বীক্বকে, তাসহীহ ও তাযয়ীফকে পরোয়া করেন না। ফলে তাঁরা প্রাচীন ইলমী তাহক্বীক্বের বাহুবলে নিজেদের মতের সমর্থনে লিফলেট ও পুস্তিকা লিখেন এবং সমর্থকরা তা ছেপে বিতরণ করেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ও সমস্যার ছন্দে পড়েন আম জনসাধারণ।

যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সঊদী আরব তথা আল্লামা আলবানীর ফতোয়া দুর্বল হতে পারে না। অন্ততঃপক্ষে দুই মতের মধ্যে বলিষ্ঠতর মত তাঁদেরই হবে, তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেন কিছু লিখার জন্য। অবশ্য অনেকে এ বিষয়ে ফালতু সময় নষ্ট করতে নিষেধও করেন। তবুও 'বললে মা মার খায়, না বললে বাবা বিড়াল খায়'-এর মত সমস্যায় পড়েও কেবল অপবাদ অপনোদনের উদ্দেশ্যে লিখতে শুরু করলাম।

এ লিখাতে কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা উদ্দেশ্য আমার নয়, বিদ্যা ফলানোও নয়। একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সেই সাথে সমাজের সংস্কার সাধন।

আশা করি, এর দ্বারা উক্ত বিষয় দুটির ব্যাপারে সালাফী সমাজ অনেক আলো পাবে। তা জানার সাথে সাথে আরো অনেক কিছু জানতে পারবে, ইন শাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে দুআ করি,

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} اللهم آمين.

বিনীত

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ

সঊদী আরব

২১/৫/২০০৮

প্রথম অধ্যায়

ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত কি বিদআত?

(এটি 'স্বালাতে মুবাশ্‌শির'-এর একটি পরিচ্ছেদ)

নামাযী যখন নামায পড়ে তখন সে আল্লাহর নিকট মুনাজাত করে। আল্লাহর সাথে নিরালায় যেন কানে কানে কথা বলে। *(মুঅত্তা, মুসনাদে আহমদ ২/৩৬, ৪/৩৪৪)*

নামাযের মাঝেই আব্দ্‌ (দাস) মাবুদের (প্রভুর) ধ্যানে ধ্যানমগ্ন থাকে। যেন সে তাঁকে দেখতে পায়। যতক্ষণ সে নামাযে থাকে ততক্ষণ সে আল্লাহর সাথে কথা বলে। তিনি তার প্রতি মুখ ফিরান এবং সালাম না ফিরা পর্যন্ত তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন না। *(বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৬১৪ নং)*

পরক্ষণে যখনই সে সালাম ফিরে দেয় তখনই সে মুনাজাতের অবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, দূর হয়ে যায় নৈকট্যের বিশেষ যোগসূত্র। বান্দা সরে আসে সেই মহান বিশ্বাধিপতির খাস দরবার থেকে। সুতরাং তার নিকট কিছু চাওয়া তো সেই সময়ে অধিক শোভনীয় যে সময়ে ভিখারী বান্দা তাঁর ধ্যানে তার নিকটে ও তাঁর খাস দরবারে থাকে। অতএব সেই নৈকট্যের ধ্যান ভগ্ন করে এবং মহানবী ﷺ এর নির্দেশিত মুনাজাত থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় মুনাজাত সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত নয়।

অবশ্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত যে, একদা সাহাবাগণ আল্লাহর রসূল ﷺ কে কোন্‌ সময় দুআ অধিকরূপে কবুল হয় - সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, "গভীর রাতের শেষাংশে এবং সকল ফরয নামাযের পশ্চাতে।" *(তিঃ৩৪৯৯, নাঃ আমালুল ইয়াউমি অল্লাইলাহ ১০৮নং, মিঃ ৯৬৮ নং)* হাদীসটি অনেকের নিকট দুর্বল হলেও আসলে তা হাসান। *(সতিঃ২৭৮-২নং)*

সুতরাং এটাই হচ্ছে ফরয নামাযের পর মুনাজাত করার প্রায় সহীহ ও সব চেয়ে বড় দলীল, যদিও এতে হাত তুলে জামাআত সহকারে দুআর কথা নেই। এইখান হতেই ধোকা খেয়ে মুনাজাত-প্রেমীরা উদ্ভাবন করেছেন যে, 'ফরয নামাযের পর দুআ কবুল হয়। আর হাত তুলে দুআ করলে আল্লাহ খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। তাছাড়া নামাযের পর লোক ও জামাআত বেশী থাকে। আর জামাআতী দুআ বেশী কবুল হয়।' ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে আযানের সময়, আযান ও ইকামতের মাঝে, ইকামতের সময়, বৃষ্টি বর্ষণের সময় ও আরো যে সব সময়ে দুআ কবুল হয় সে সব সময়ে কৈ জামাআতী দুআ নজরে পড়ে না। অভ্যাসে পরিণত হয়েছে কেবল ফরয নামাযের পর দুআ।

শুরুতে একটা কথা খেয়াল রাখা উচিত যে, ইবাদত যখন, যেভাবে, যে গুণ, সংখ্যা ও পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধ হয়েছে প্রত্যেকটি ইবাদত সেই গুণ, পদ্ধতি, সংখ্যা ও সময় অনুসারে করা জরুরী। অনির্দিষ্ট বা সাধারণ থাকলে তা কোন গুণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা বিদআতের পর্যায়ভুক্ত।

সুতরাং দুআর এক সাধারণ নিয়ম হল, হাত তুলে দুআ করা। অর্থাৎ কেউ নিজ প্রয়োজনে সাধারণ সময়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে হাত তুলে করবে। এখন যদি কেউ বলে, 'আমি আমার প্রয়োজন নামাযে চাই বা না চাই, নামাযের পরে রসূলের বা নিজের ভাষায় হাত তুলে চাইব'- তাহলে তার প্রথমে জানা উচিত যে, নামাযের পর একটি নির্দিষ্ট সময়। আর তাতে রয়েছে নির্দিষ্ট ইবাদত (যিকর-আযকার)। অতএব ঐ নির্দিষ্ট সময়ে শরীয়ত কি করতে নির্দেশ করেছে? যা করতে নির্দেশ করেছে তার নিয়ম কি? ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে অনুরূপ সাধারণ নিয়ম সংযোজন করা যাবে না। করলেই তা অতিরঞ্জন তথা বিদআত রূপে পরিগণিত হবে। ফলকথা, তাকে দেখতে হবে যে, ঐ নির্দিষ্ট ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টরূপে দুআ বা মুনাজাতের নির্দেশ শরীয়তে আছে কি? নচেৎ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (শরীয়তের)

ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা ওর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত ১৪০নং)* "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮-নং)*

এবার প্রশ্ন থাকছে উপরোক্ত হাদীস মুনাজাতের স্বপক্ষে দলীল কি না?

উক্ত হাদীসে যে 'দুবুর' শব্দ ব্যবহার হয়েছে তার অর্থ হল, পিঠ, পাছা, পশ্চাৎ বা শেষাংশ। যাঁদের অর্থে 'দুবুর' মানে 'পরে', তাঁদের মতে এই হাদীসটি ফরয নামাযের পর দুআ বা মুনাজাতের বড় দলীল। (যদিও হাত তুলে ও জামাআত করে নয়।) কিন্তু উক্ত হাদীসে 'দুবুর' শব্দের অর্থ পরে করা ঠিক কি?

এখন যদি বলি, 'গরুর দুবুর (পাছা)', তাহলে শ্রোতা এই বুঝবে যে, গরুর পাছা দেহের অবিচ্ছেদ্য পিছনের অঙ্গ। তার দেহাংশের বাইরের কিছু নয়। সুতরাং নামাযের দুবুর, বা পাছা অথবা পশ্চাৎ বলতে বুঝা দরকার যে, তা নামাযেরই শেষ অঙ্গ বা অংশ। নামাযের বাইরের কিছু নয়; অর্থাৎ সালাম ফিরার পূর্বের অংশ।

অবশ্য 'দুবুর' (পশ্চাৎ) বলে পরের অংশকেও বুঝানো যায়। যেমন যদি বলি, 'ইমাম সাহেব বাসের দুবুরে (পশ্চাতে বা পেছনে) দাঁড়িয়ে আছেন।' তাহলে ইমাম সাহেবকে যে দেখেনি সে শ্রোতা দুই রকম বুঝতে পারে; প্রথমতঃ এই যে, ইমাম সাহেব বাসের পেছনের অংশে বাসের ভিতরেই দাঁড়িয়ে আছেন। আর দ্বিতীয়তঃ এই যে, ইমাম সাহেব বাসের পেছনে রোডে (বাসের বাইরে) দাঁড়িয়ে আছেন। আর এক্ষেত্রে শ্রোতার দুই প্রকার বুঝাই সঠিক, ভুল নয়। কিন্তু ইমাম সাহেবের আসল দাঁড়াবার জায়গা বাস্তবপক্ষে একটাই, বিধায় অপরটি অসম্ভব।

সুতরাং উক্ত হাদীসের অর্থ যদি 'নামাযের পশ্চাতে অর্থাৎ সালাম ফিরার পূর্বে দুআ কবুল হয়' বলি, তাহলে একথাও বলতে হয় যে, 'সালাম ফেরার পূর্বেই তসবীহ-তাহলীলও করতে হবে।' কারণ ওখানেও 'দুবুর' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থে উলামাগণ নামাযের পর যিক্র পড়ার কথা বলে থাকেন। অতএব উক্ত দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যাখ্যা খুঁজতে আমাদেরকে শরীয়তের সাহায্য নিতে হবে। যেহেতু মহানবী ﷺ এর এক উক্তিকে তাঁর অপর উক্তি বা আমল ব্যাখ্যা করে। চলুন এবারে আমরা তাই দেখে 'দুবুর' এর সঠিক অর্থ নির্ধারণ করি।

সালাম ফেরার পরে কি করা উচিত সে ব্যাপারে আল্লাহর এক নির্দেশ হল, "অতঃপর যখন তোমরা নামায সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহর যিক্র কর----।" *(কুঃ ৪/১০৩)* "তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং নামাযের পরেও।" *(কুঃ ৫০/৪০)* তাই তো আল্লাহর নবী ﷺ এর আমল ও অভ্যাস ছিল সালাম ফিরার পর আল্লাহর যিক্র করা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ "আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালাম--- " বলার মত সময়ের চেয়ে অধিক সময় সালাম ফেরার পর বসতেন না। *(মুঃ মিঃ ৯৬০ নং)*

সাওবান ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামায শেষ করতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার করে "আল্ল-হুম্মা আন্তাস সালাম---- " বলতেন।

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন সালাম ফিরতেন তখন উঁচু শব্দে বলতেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু ---।" *(মুসলিম, মিশকাত৯৬৩ নং)* (এ ব্যাপারে ফরয নামাযের পর যিক্রের আলোচনা দেখুন।)

সালাম ফিরা হলে তিনি মহিলাদের জন্য একটু অপেক্ষা করতেন, যাতে তারা পুরুষদের আগেই মসজিদ ত্যাগ করতে পারে। অতঃপর তিনি উঠে যেতেন। *(বুখারী ৮৩৭)*

সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ বলেন, ফজরের নামায শেষ করে আল্লাহর নবী ﷺ আমাদের দিকে ফিরে বসে বলতেন, "গত রাত্রে তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে?" অতঃপর কেউ দেখলে সে বর্ণনা করত। নচেৎ তিনি নিজে স্বপ্ন দেখে থাকলে তা বর্ণনা করতেন। *(বুখারী,মিশকাত ৪৬২১ নং)*

অবশ্য একদা কা'বা শরীফের নিকট মহানবী ﷺ এর নামায পড়া কালে কুরাইশের দুষ্কৃতীরা তাঁর সিজদারত অবস্থায় ঘাড়ে উঁটনীর (গর্ভাশয়) ফুল চাপিয়ে দিলে হযরত ফাতেমা (রাঃ) খবর পেয়ে ছুটে এসে তা সরিয়ে ফেলেন। এহেন দুর্ব্যবহারের ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ করে উচ্চস্বরে ঐ দুষ্কৃতীদের জন্য বদ্দুআ করেন এবং তা কবুলও হয়ে যায়। *(বুখারী ২৪০, মুসলিম ১৭৯৪ নং)*

কিন্তু সে নামায ফরয ছিল না নফল, তা নিশ্চিত নয়। পরন্তু এতে হাত তোলার কথা নেই। তাছাড়া এটি ছিল তাৎক্ষণিক বদ্দুআ; যা তাদেরকে শুনিয়ে করা হয়েছিল।

আর একটি সহীহ হাদীসে এসেছে যে, তিনি ফজরের নামাযে সালাম ফিরে বলতেন, "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআউঁ অরিযকান ত্বাইয়িবাঁউ অআমালাম মুতাক্বাব্বালা।" (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অবশ্যই ফলপ্রসূ জ্ঞান, উত্তম রুযী এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।) *(ত্বাবারানী, সাগীর, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/ ১১১, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/ ১৫২)*

অন্য এক হাদীসে তিনি বলতেন, 'রাব্বি ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআষু (অথবা তাজমাউ) ইবা-দাক।' হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তোমার সেই দিনের আযাব থেকে বাঁচায়ো, যেদিন তুমি স্বীয় বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে কিংবা হিসাবের জন্য জমা করবে। *(মুসলিম ১৬৭৬নং)*

অবশ্য এখানেও হাত তোলার কথা নেই।

সুতরাং বলা যায় যে, সালাম ফিরার পর আল্লাহর নবী ﷺ অধিকাংশ সময়ে আল্লাহর যিক্র পড়েছেন। আর কখনো কখনো তিনি ফজরের পর ঐ দুআ (হাত না তুলে) পাঠ করেছেন।

পক্ষান্তরে সালামের পূর্বে তিনি (প্রার্থনামূলক) দুআ পড়তে আদেশ দিয়ে বলেন, "এরপর (তাশাহহুদের পর) তোমাদের যার যা ইচ্ছা ও পছন্দ সেই মত দুআ বেছে নিয়ে দুআ করা উচিত।" *(বুখারী ৮৩৫, মুসলিম, মিশকাত ৯০৯ নং)*

"যখন তোমাদের মধ্যে কেউ (শেষ) তাশাহহুদ সম্পন্ন করবে তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস থেকে পানাহ চায়; জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। এরপর সে ইচ্ছামত দুআ করবে।" *(মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ, আবূ দাউদ ৯৮৩নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৯৪০নং)*

সালাম ফিরার পূর্বে তাশাহহুদের পর তিনি নিজেও বিবিধ প্রকার দুআ পড়ে প্রার্থনা করেছেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৩৯নং) (দুআয়ে মাসূরা দ্রষ্টব্য)* এমন কি উক্ত চার প্রকার আযাব ও ফিতনা হতে পানাহ চাওয়ার দুআ আল্লাহর নবী ﷺ কুরআন কারীমের সূরা শিখানোর মত সাহাবাগণকে শিক্ষা দিতেন। তাই তো ৩ অথবা ৪ জন সাহাবী হতে উক্ত দুআর হাদীস বর্ণনাকারী তাবেয়ী ত্বাউস একদা তাঁর ছেলেকে বললেন, 'তুমি তোমার নামাযে ঐ দুআ পড়েছ কি? বলল, না। তিনি বললেন তাহলে তুমি তোমার নামায ফিরিয়ে পড়।' *(মুসলিম ১/৪১৩ নং)*

কেননা, তাঁর নিকট উক্ত দুআর এত গুরুত্ব ছিল যে, তিনি মনে করতেন, যে দুআ পড়তে আল্লাহর নবীর আদেশ, আমল ও শিক্ষা রয়েছে তা না পড়লে নামাযই হবে না!

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ (মসজিদে) বসে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করে নামায শুরু করল। (নামাযে) সে বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর।' তা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তাড়াহুড়ো করলে তুমি হে নামাযী! যখন তুমি নামাযে বসবে তখন আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রসংশা কর এবং আমার উপর দরূদ পড়, তারপর আল্লাহর নিকট দুআ কর।"

কিছুক্ষণ পরে আর এক ব্যক্তি নামায পড়তে শুরু করল, সে আল্লাহর প্রশংসা করে নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করল। তখন তা শুনে তিনি বললেন, "হে নামাযী! (এবার তুমি) দুআ কর, কবুল হবে।" *(তিঃ ৩৪৭৬, আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত ৯৩০ নং)*

ইবনে মসউদ বলেন, 'একদা আমি নামায পড়ছিলাম, আর নবী ﷺ, আবু বাক্র ও উমার

ﷺ (পাশেই বসে) ছিলেন। যখন আমি বসলাম তখন আল্লাহর প্রশংসা ও দরূদ শুরু করলাম। তারপর আমি নিজের জন্য দুআ করলাম। তা শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি চাও, তোমাকে দান করা হবে, তুমি চাও, তোমাকে দান করা হবে।" *(তিরমিযী, মিশকাত ৯৩১ নং)*

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় সে তখন তার রবের সাথে মুনাজাত করে। অতএব মুনাজাতে সে কি বলে, তা তার জানা উচিত। *(মুঅত্তা, মুসনাদে আহমদ ২/৩৬, ৪৯২৮নং)* অতএব সঠিক মুনাজাতের স্থান ও দুআ কবুল হওয়ার সময় সালাম ফিরার পূর্বে নয় কি?

পরন্তু যদি 'দুবুর' শব্দের অর্থ 'পরে' ধরে নেওয়া যায় তবুও তাতে হাত তুলে মুনাজাত প্রমাণ হয় না। আর এখানে হাত তুলে দুআ করা দুআর আদব বলে এবং আল্লাহ (হাত তুলে দুআ করলে) খালি হাত ফিরিয়ে দেন না বলে এখানেও তোলা হবে বা তুলতে হবে, তা বলা যায় না। ঐ দেখুন না, জুমআর খুতবায় দুআ বিধেয়। নবী ﷺ বৃষ্টির জন্য হাত তুলে খুতবায় দুআও করেছেন। কিন্তু সাধারণ সময়ে খুতবায় তিনি হাত তুলতেন না। তাইতো উমারাহ বিন রুয়াইবাহ যখন বিশ্‌র বিন মারওয়ানকে জুমআর খুতবায় হাত তুলে দুআ করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ ঐ হাত দুটিকে বিকৃত করুক! আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে কেবল তাঁর আঙ্গুল দ্বারা এভাবে ইশারা করতে দেখেছি। *(মুসলিম ৮৭৪, আবূ দাঊদ,তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে আবী শাইবাহ ৫৪৯৬ নং)*

সুতরাং হাত তুলে দুআর আদব হলেও যেহেতু ঐ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি হাত তুলেন নি, তাই সলফগণ তা বৈধ মনে করতেন না। যুহরী বলেন, 'জুমআর দিন হাত তোলা নতুন আমল (বিদআত)।' *(ইবনে আবী শাইবাহ ৫৪৯১ নং)* ত্বাউস জুমআর দিন হাত তুলে দুআকে অপছন্দ করতেন এবং তিনি নিজেও হাত তুলতেন না। *(ঐ ৫৪৯৩ নং)*

ইমাম ও মুক্তাদীগণের খুতবায় হাত তুলে দুআ প্রসঙ্গে মাসরূক বলেন, (যারা ঐভাবে দুআ করে) 'আল্লাহ তাদের হাত কেটে নিক।' *(ঐ ৫৪৯৪ নং)*

সুতরাং একথা স্পষ্ট হল যে, ফরয নামাযের পর দুআ বৈধ ধরা গেলেও হাত তুলে দুআর আদব বলে হাত তোলা এখানেও বিদআত হবে, যেমন জুমআর খুতবায় হবে। কারণ নামাযের পরে মহানবী ﷺ এর আদর্শ ও তরীকা আমাদের সামনে মজুদ।

এ তো গেল একাকী হাত তুলে মুনাজাতের কথা। অর্থাৎ একাকী নামাযীর জন্যও বিধেয় নয় ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করা।

বাকী থাকল জামাআতী দুআর কথা, তো তার প্রমাণ আরো দুঃসাধ্য। যাঁরা করেন বা করা ভালো মনে করেন তাঁরা বলেন, যে, 'জামাআতের দুআ একটি সুবর্ণ সুযোগ।' এর প্রমাণে তাঁরা এই যুক্তি পেশ করেন যে, 'জামাআতে দুআ করলে দুআ কবুল হয়। একাকী অনেকের দুআ কবুল নাও হতে পারে। সুতরাং পাঁচজন ভালো লোকের ফাঁকে একজন মন্দলোকেরও দুআ কবুল হয়ে যায়!' তাঁরা আরো বলেন, 'কোন নেতার কাছে কোন দাবী বা আবেদনের ব্যাপারে একার চেয়ে যৌথ ও জামাআতী চেষ্টাতেই কৃতার্থ হওয়া অধিক সম্ভব।' ইত্যাদি।

কিন্তু প্রথমতঃ যুক্তিটি দলীল-সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার ভীতু নেতাদের সাথে সার্বভৌম ক্ষমতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার অধিকারী মহান আল্লাহকে তুলনা করা বেজায় ভুল ও হারাম।

পরন্তু যদি তাই হয়, তবে এ যুক্তি ও সুযোগের কথা মহানবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবাগণ কি জানতেন না? নাকি তাঁদের চেয়ে ওঁরা বেশী জানলেন? কই তাঁরা তো এই সুযোগ গ্রহণ করে অনুরূপ জামাআতী দুআ ফরয নামাযের পর করে গেলেন না?

পরন্তু তাঁরাও জামাআতী কল্যাণে জামাআতবদ্ধভাবে দুআ করেছেন; বিপদ-আপদের সময় ফরয নামাযের শেষ রাকআতে রুকু থেকে উঠার পর কওমায় হাত তুলে মুসলিমদের জন্য

জামাআতী দুআ ও কাফেরদের জন্য বদ্দুআ করেছেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৮৮, ১২৮৯, ১২৯০ নং)*

সাহাবাগণ রমযানের বিত্র নামাযে রুকুর পূর্বে বা পরে হাত তুলে জামাআতী দুআ করেছেন। *(মুঅত্তা, মিশকাত ১৩০৩ নং)*

তাঁরা নামাযের ভিতরেই হাত তুলে জামাআতী দুআ করেছেন। কিন্তু নামাযের পর করা উত্তম হলে তা করতেন না কি? আর প্রত্যহ পাঁচ-অক্ত নামাযে তা করে থাকলে কোন একটি সহীহ হাদীসে তার বর্ণনা আসত না কি?

একদা মহানবী ﷺ জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক মরুবাসী (বেদুঈন) উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেল, আর পরিবার-পরিজন (খাদ্যের অভাবে) ক্ষুধার্ত থেকে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' তখন মহানবী ﷺ নিজের দুই হাত তুলে দুআ করলেন। ফলে এমন বৃষ্টি শুরু হল যে পরবর্তী জুমআতে উক্ত (বা অন্য এক) ব্যক্তি পুনরায় খাড়া হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ঘর-বাড়ি ভেঙে গেল এবং মাল-ধন ডুবে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দুআ করুন!' মহানবী ﷺ তখন তিনি নিজের হাত তুলে পুনরায় বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দুআ করলেন এবং বৃষ্টিও গেল থেমে। *(বুখারী ৯৩৩নং, মুসলিম, নাসাঈ, মুসনাদ আহমদ ৩/২৫৬, ২৭১)*

অতএব বুঝা গেল যে, নামাযের পর দুআর অভ্যাস ছিল না বলেই উক্ত সাহাবী যে সময় কথা বলা এবং কেউ কথা বললে তাকে চুপ করতে বলাও নিষিদ্ধ সেই সময় আল্লাহর নবী ﷺ কে দু' দু'বার দুআর আবেদন জানালেন।

সায়েব বিন য়্যাযীদ বলেন, একদা আমি মুআবিয়া رضي الله عنه এর সাথে (মসজিদের) আমীর-কক্ষে জুমআর নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরলে আমি উঠে সেই জায়গাতেই সুন্নত পড়ে নিলাম। অতঃপর তিনি (বাসায়) প্রবেশ করলে একজনের মারফৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তুমি যা করলে তা আর দ্বিতীয়বার করো না। জুমআর নামায সমাপ্ত করলে কথা বলা অথবা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে আর অন্য কোন নামায মিলিয়ে পড়ো না। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, (মাঝে) কথা না বলে বা বের হয়ে না গিয়ে কোন নামাযকে যেন অন্য নামাযের সাথে মিলিয়ে না পড়ি।' *(মুসলিম ৮৮৩, আবু দাউদ ১১২৯নং, মুসনাদে আহমদ ৪/৯৫, ৯৯)*

উক্ত হাদীস নিয়ে একটু চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সাহাবাদের যুগেও ঐ মুনাজাতের ঘটা বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং তা যে নব-আবিষ্কৃত বিদআত তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

কিন্তু অজান্তে লোকেরা শাঁস ছেড়ে আঁটিতে কামড় মারছে! যেখানে দুআ করা ওয়াজিব বা বিধেয় সেখানে না করে অসময় ও অবিধেয় স্থানে দুআ করার জন্য মারামারি! আবার কেউ না করলে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি!! কিন্তু তাও কি বৈধ?

অতএব আপনি যদি জ্ঞান ও বিবেকের সাহায্যে শরীয়তের মাপকাঠিতে ইনসাফ করতে চান এবং দ্বিধাবিভক্ত সমাজের সংকীর্ণ মনের মানুষদের হৃদয়-দ্বারকে উদার ও উন্মুক্ত করে শৃঙ্খলা আনতে চান, তাহলে নিশ্চয় এ ব্যাপারে আসল সত্য আপনার নিকটও প্রকট হয়ে উঠবে ইন শা-আল্লাহ। পক্ষান্তরে আপনি তো চান আল্লাহর অনুগ্রহ, আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত। তবে তা যদি এ সময় ছাড়া অন্য সময়েই পাওয়া যায়, তাহলে তা সে সময়েই চেয়ে নিতে বাধা কোথায়? কথায় বলে, "ঢেঁকিশালে যদি মানিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই?" মোট কথা আপনার প্রয়োজন আপনি আপনার নামাযেই ভিক্ষা করুন। আপনার আপদে-বিপদে ও বালা-মসীবতে নামাযেই সাহায্য প্রার্থনা করুন। বিশেষ করে আল্লাহ যেহেতু বলেন, "তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" *(সূরা বাক্বারাহ ৪৫, ১৫৩ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "জুমআর দিনে এমন একটি (সামান্য) মুহূর্ত আছে, যদি কোন মুসলিম বান্দা

নামায পড়া অবস্থায় তা পায় এবং আল্লাহর নিকট কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দিয়ে থাকেন।" *(বুখারী ৯৩৫নং, মুসলিম, মিশকাত ১৩৫৭নং)*

অতএব খেয়াল করে দেখুন হয়তো বা যে প্রয়োজন আপনি ভিক্ষা করবেন সেই প্রয়োজনের দুআ নামাযেই রয়েছে। নচেৎ অনুরূপ সহীহ দুআ বেছে নিয়ে আপনি দুআর স্থানে নামাযেই করতে পারেন। আর যদি নিজের ভাষাতেই দুআ করতে হয়, তাহলে দুআ কবুল হওয়ার আরো বহু সময় আছে। সেই সাধারণ সময়ে আপনি আপনার বিনয়ের হাত তুলে খুব করে যত পারেন আল্লাহর নিকট চেয়ে নিন। আপনি একা হলেও -আল্লাহর ওয়াদা- তিনি বান্দার দুআ কবুল করেন; যদি সঠিক নিয়মে হয়। নাইবা চাইলেন ঐ বিতর্কিত সময়ে!

তাছাড়া নামাযের ভিতর মুনাজাতের ঐ নয়নাভিরাম বাগিচায় প্রায় আটটি স্থানে দুআ করার সুযোগ রয়েছে; তাকবীরে তাহরীমার পর, রুকুতে, কওমাতে, সিজদায়, দুই সিজদার মাঝে, তাশাহহুদে, রুকুর পূর্বে অথবা পরে কুনূতে এবং কুরআন পাঠকালে রহমতের আয়াত এলে রহমত চেয়ে এবং আযাবের আয়াত এলে আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে নামাযী দুআ করে থাকে। *(ফাতহুল বারী ১১/১৩৬)* আর উক্ত স্থানগুলিতে কি নিয়ে দুআ করবেন তা তো (সালাতে মুবাশ্‌শিরে) জেনেছেন। সুতরাং এতগুলো স্থান কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?

কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকে সে সব দুআকে কেবল নামায বলেই জানে ও চেনে। দুআ বলে নয়। ফলে পূর্ণ সমর্থন করে জামাআতী দুআকে। হয়তো বা তার কারণ এই যে, মুখস্থ করে দুআ করা কষ্টকর ব্যাপার, অথচ নামাযের পর জামাআতে কেমন আরামসে কেবল 'আমীন-আমীন' বললেই দুআ ও সহজে কিস্তিমাত হয়ে যায়! পক্ষান্তরে ইমাম সাহেব কি দুআ করলেন তার খবর নেই, দুআর অর্থের প্রতি খোঁজ নেই, দুআর প্রতি মনোযোগ নেই - এমন দুআয় ফল কোথায়? মহানবী ﷺ বলেন, "আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ বিস্মৃত ও উদাসীন হৃদয়ের দুআ মঞ্জুর করেন না।" *(তিরমিযী ৩৪৭৯ নং)*

দুআ বিদআতের ফতোয়া শুনে অনেকের অনেক রকম অভিযোগ। কেউ বলেন, 'দুআ উঠে যাচ্ছে, কিছু দিন পর নামাযও উঠে যাবে হয়তো!' অথচ নামাযের পর দুআ ও নামায এক নয়। নামায হল দ্বীনের খুঁটি। আর নামাযের পর হাত তুলে দুআ তো ভিত্তিহীন। সুতরাং যার ভিত নেই, তা টিকে কেমনে?

এক মসজিদে জামাআতের সময় হয়ে এসেছিল। ওযু করতে দেরী হওয়ায় আমাদের অপেক্ষা করছিল জামাআত। এক সাহেব কারণ জানতে চাইলে কেউ বললেন, 'আরবের মাওলানা ওযু করছেন, একটু থামুন।' কিন্তু চট্ করেই এক সাহেব বলে উঠলেন, 'আরবের লোকদের দুআ না হলে চলে, ওযু না হলেও তো চলবে!'

তার মানে ঐ লোকের নিকট নামাযের শর্ত ওযূ এবং ফরয নামাযের পর দুআ একই জিনিস। তাছাড়া আল্‌গা জিভে ঐ কথা বলে অজ্ঞানতার পরিচয় দেবেন কেন?

অনুরূপ অনেকে বলেন, **'কম্বলের রোঁয়া বাছতে সব শেষ।' 'তাহলে সাজদা রুকু কোয়ুদ, তাশাহহোদ, দোয়ার ধরণের মতো পাঠাবে নাকি? বিজ্ঞান যেমন অনেক আবিষ্কারে পাল্টিয়েছে। এই ভাবে শারিয়াতের আমল অনেক বাদ অবশ্য পড়েছে। বাদ দিতে দিতে কম্বলের লোমের মতো বাছতে বাছতে সব বাদ পড়ে যাবে নাকি? এরা মনে হয়, নামাজ রোযাও রাখবে না। দেখি কত দূর গড়ায়!!!!'**

বক্তার ধারণামতে শরীয়তের সবকিছুই কম্বলের রোঁয়া। অর্থাৎ ফরয, সুন্নত, নফল, বিদআত সবই সমান! অথচ প্রকৃতপক্ষে বিদআত উচ্ছেদ কম্বলের রোঁয়া বাছা নয়; বরং ফুল বাগানের আগাছা অথবা ধানক্ষেতের ঝোড়া বাছা।

শরীয়ত জ্ঞান করে যে সকল আমল শরীয়তে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং অসাবধানতায়

আমাদের দেশের হুযুররা আমল শুরু করে দিয়েছেন, তা বাদ দিলে তাঁরা মনে করেন সুন্নত বা ফরয বা দ্বীনের মৌলিক অংশ বাদ চলে গেল। তাঁরা মনে করেন, তাঁরা যেটা করেন, তা ভুল হতে পারে না। তাই কোন সত্যানুসন্ধানী আলেম তাঁদের ভুল ধরলে ইয্যতে লাগে, সম্মান ও গদির মায়া ছাড়তে বড় মায়া লাগে। 'সোনা বলে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিতল হল' তা সত্ত্বেও তাঁরা পিতলকেই সোনা বলে চালাতে চান। দ্বীনে অনুপ্রবিষ্ট 'বিদআত' ত্যাগ করতে বললে তাঁরা মনে করেন, দ্বীনই ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে হয়তো!

প্রসঙ্গতঃ ইবনে মাসঊদ ﷺ-এর একটি উক্তি মনে আসে, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে, যখন ফিতনা তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেবে? যাতে বড় বৃদ্ধ হবে এবং ছোট প্রতিপালিত (হয়ে বড়) হবে। মানুষ যাকে সুন্নাহ জ্ঞান করবে। যখন তা (ফিতনা বা বিদআত) অপসারিত করা হবে তখন লোকেরা বলবে, 'সুন্নাত অপসারিত হল।' একজন জিজ্ঞাসা করল, 'হে আবু আব্দুর রহমান! এরূপ কখন হবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের ক্বারীর সংখ্যা অধিক হবে এবং ফকীহ (অভিজ্ঞ আলেমদের) সংখ্যা কম হবে, তোমাদের নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে ও আখেরাতের কর্ম দ্বারা দুনিয়ার সম্পদ অন্বেষণ করা হবে।" *(দারেমী ১/৬৪ নং)*

অনেকে বলেন, 'পায়জামা খাটাতে খাটাতে শেষকালে দেখছি আন্ডারপ্যান্ট্ হয়ে যাবে!'

অর্থাৎ ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ উঠে গেলে যেন দ্বীনের মূল অংশ বাদ পড়ে গেল! এঁদের নিকটে মুড়ি-মুড়কির সমান দর। কাক-কোকিলের কোন পার্থক্য নেই। অথচ ইসলামে অতিরঞ্জনের স্থান নেই। ইসলামে কোন কিছু এমন নেই যাতে সংযোজন করা যাবে অথবা কিছু হ্রাস করা যাবে। বাড়তি নখ-চুল কাটা অবশ্যই বাঞ্ছিত, আঙ্গুল বা মাথা কাটা নয়। পায়জামা গাঁটের নিচে ঝুলে রাস্তার ময়লা লাগলে অবশ্যই জ্ঞানীগণ তা কেটে গাঁটের উপর পর্যন্ত করে নেন। কারণ তাঁরা জানেন যে, গাঁটের নিচে কাপড় পরা হারাম। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় বাড়তি অংশ কাটা তো সকলের নিকট জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সম্মত। আর বাড়তি অংশ কাটলেই যে আসল অংশও কাটা যাবে তা জরুরী নয়। অবশ্য যাঁদের নিকটে আসল-নকলের কোন পার্থক্য-জ্ঞান নেই তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

তাছাড়া বাড়তি ও বেশী করার প্রয়োজন কোথায়? অল্প মেহনতে ফল ও কাজ একই হলে সেটাই যথেষ্ট ও ঈপ্সিত নয় কি? নচেৎ 'চাষার চাষ করা দেখে চাষ করলে গোয়াল, ধানের সঙ্গে খোঁজ নাই বোঝা বোঝা পোয়াল' হবে না কি?

অনেকে বলেন, 'ওঁরা কি জানতেন না, যাঁরা এতদিন নিয়মিতভাবে দুআ করে গেলেন?' কিন্তু এর উত্তরে আমরাও প্রশ্ন করতে পারি, 'ওঁরা কি জানতেন না, যাঁরা কখনো মুনাজাত করে যাননি, বা জানেন না যাঁরা এখনো মুনাজাত করেন না ?' সুতরাং দলীলই প্রমাণ করবে কে জানতেন আর কে জানতেন না। পক্ষান্তরে যাঁরা ইজতিহাদে ভুল করে গেছেন, আল্লাহ তাঁদের ভুল ক্ষমা করবেন এবং তাঁরা একটি নেকীর অধিকারীও হবেন। অতএব যাঁরা না জেনে করে গেছেন তাঁদেরকে 'বিদআতী' বলার অধিকারও কারো নেই। তবে সঠিক পথ জানার পর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা অবশ্যই ওয়াজেব।

অনেকে বলেন, 'দুআ তো ভালো জিনিস। ওতে ক্ষতি কি?' কিন্তু ভালো হলেই যে বাড়তি করার অধিকার আছে, তা নয়। নামায ভালো বলে ২ রাকআতের স্থানে ৩ রাকআত বেশী পড়া যায় না। দরূদ ভালো হলেও জামাআতী সমস্বরে বা দাঁড়িয়ে কিয়াম করে দরূদ পড়া যায় না। এই বাড়তি করার নামই তো বিদআত।

অনেকে বলেন, 'দুআ উঠে গেল তাই তো নানা কষ্ট, নানা বিপদ-আপদ দেখা দিচ্ছে মুসলিম সমাজে।' অবশ্য এমন লোকেরা নামাযের পর হাত তুলে দুআ ছাড়া আর অন্য দুআ চেনেন না।

তাই তো কেউ ফরয নামাযের পর মুনাজাত না করলে অনেকে কুরআনের আয়াত থেকে দলীল উদ্ধৃত করে তাকে জাহান্নামী বানিয়ে থাকেন! কারণ আল্লাহ বলেন, “তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার নিকট দুআ কর, আমি তা কবুল করব। যারা অহংকারে আমার ইবাদত (দুআ) করায় বিমুখ তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” *(সূরা মুমিন ৬০ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, এমন বক্তার নিকট দুআ এবং ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআর মাঝে কোন পার্থক্যই নেই। তাই তো ঝোঁপ না বুঝেই কোপ মেরে থাকেন!

অনেকে বলেন, ‘ফরয নামাযের পর ঐরূপ দুআ করতে নিষেধ আছে কি?’ কিন্তু নিষেধ না থাকলে যদি করা যেত, তাহলে তো বহু কিছু করা যায়। আযান ও নামায ভালো জিনিস বলে সকাল ৯টায় আযান দিয়ে জামাআত করে নামায পড়তে পারি কি? কারণ ঐ সময় ঐ আমল তো নিষেধ নয়। তবে দরূদে সমস্বরকে কেন বিদআত বলি, সমস্বরে দরূদ তো নিষেধ নয়---ইত্যাদি। এরূপ মুনাজাত নেই তার প্রমাণ হল হাদীসে বা আসারে তার উল্লেখ নেই। পরন্তু কোন ইবাদত ‘নেই’ প্রমাণ করতে দলীলের প্রয়োজন হয় না; কারণ ‘নেই’ এর দলীলই হল কুরআন-হাদীসে এর উল্লেখ নেই। অবশ্য ‘আছে’ প্রমাণ করতে স্পষ্ট দলীল জরুরী। তাই তো যে কর্ম করতে নিষিদ্ধ বলে প্রমাণ আছে তা করাকে ‘হারাম’ বলে, ‘বিদআত’ নয়। পক্ষান্তরে যা ‘আছে’ বলে প্রমাণ নেই তা দ্বীন ও ভালো মনে করে করাকেই নতুনত্ব বা বিদআত বলে। আর মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪০নং)* “যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।” *(মুসলিম ১৭১৮-নং)* “আর নবরচিত কর্মসমূহ থেকে দূরে থেকো। কারণ, নবরচিত কর্ম হল বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।” *(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং)* “আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই হল জাহান্নামে।” *(সহীহ নাসাঈ ১৪৮৭নং)*

সুতরাং বিদআতের ভালো-মন্দ কিছু নেই। বরং তার সবটাই মন্দ। আর যা বিদআত, তা জরুরী মনে না করে করলেও বিদআত এবং কখনো কখনো করাও বিদআত। নচেৎ এর প্রমাণে দলীল জরুরী। যেমন যদি বলি, ‘কিয়াম করা বিদআত, তবে জরুরী মনে না করে করা বিদআত নয়’ বা ‘কখনো কখনো করা বিদআত নয়’ তবে নিশ্চয় তা যুক্তিসঙ্গত নয়। তদনুরূপ ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ যদি বিদআতই হয়, তবে তা অজরুরী মনে করে কখনো কখনো করা কোন যুক্তিকে দূষণীয় হবে না?

পরিশেষে এখানে ইবনে মসউদ ﷺ এর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করি; তিনি বলেন, “তোমরা অনুসরণ কর, নতুন কিছু রচনা করো না। কারণ তোমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। আর তোমরা পুরাতন পন্থাই অবলম্বন কর।” *(সিলসিলা যয়ীফাহ ২/ ১৯)*

(ফরয নামাযের পর একাকী বা জামাআতী মুনাজাত বিদআত হওয়া প্রসঙ্গে ফতোয়া দেখুন। *(মবঃ ১৭/৫৫, ২০/ ১৪৭, ২৪/৭০, ৯২, ফউঃ ১/৩৬৭, মুমঃ ৩/২৭৭-২৮২, ফইঃ ১/৩১৯, প্রভৃতি)*

সবশেষে বলি যে, হাত তুলে মুনাজাত নেই বলে সালাম ফিরার পরপরই উঠে সুন্নত পড়তে শুরু করা অথবা প্রস্থান করা এবং যিক্‌র-আযকার ত্যাগ করা অবশ্য উচিত নয়।
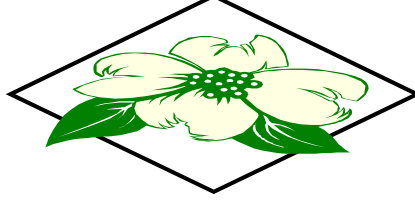
দ্বিতীয় অধ্যায়

ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাতের প্রমাণ ও তার খণ্ডন

দুআ ইবাদতের মগজ। দুআ মুমিনের অস্ত্র। কিন্তু সেই মগজ ও অস্ত্র কোথায় কিভাবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে হবে, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু একটা কথা লক্ষ্য করেছি, যাঁরা গভীর জলের মাছ, তাঁরা চুপ থেকে উদার মনে দলীলের ভিত্তিতেই একটা মত গ্রহণ করে উদার-নীতি অবলম্বন করেছেন। বিশেষ করে যাঁরা মুসলিম বিশ্বের প্রাণ-কেন্দ্র সউদী আরবের সাথে যোগাযোগ রাখেন এবং সেখানকার মুফতী, ফুকাহা ও উলামাগণকে নিজেদের থেকে বেশী বড় মনে করেন তাঁরা শুনেছেন, জেনেছেন, দেখেছেন ও মেনেছেন যে, 'ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী দুআ' বিদআত তথা শরীয়তে নব আবিষ্কৃত আমল। অপর পক্ষে অনেক উলামা বিদআত ফতোয়া মেনে নিতে পারেননি। আর পারবেনই বা কি করে? من شب على شي شاب عليه.

যে আমল তাঁদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, সে আমল পরিত্যাগ করবেন কিভাবে? যেভাবে পূর্ব-জীবনে সমাজের মানুষকে নিয়ে ভুল করে এসেছেন, তা ভুল বলে স্বীকার করাও তো একটা প্রেস্‌টিজের ব্যাপার! আর তাছাড়া তাঁরা দুআ ওয়াজেব, মুস্তাহাব ও জায়েয হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করার মত ক্ষমতাও রাখেন; যদিও এ ক্ষমতা রাখেন না যে, সে দলীল সহীহ কি না তা যাচাই করে দেখেন।

সত্য কথা এই যে, এটি একটি অনর্থক বিষয়। আকীদা ও হারাম-হালালের কত বিষয় বাদ দিয়ে 'জায়েয' বিষয় প্রমাণ করার জন্য এত কাঠ-খড় পোড়ানো! সত্যই বলেছেন মহানবী ﷺ,

(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) . رواه مالك وأحمد

সুন্দর ইসলামের পরিচায়ক এটাই যে, যে জিনিস তার বিষয়ীভূত নয়, তা সে ত্যাগ করবে।

ডাক্তার হয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কথা এবং ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ডাক্তারের কথা বলা সত্যই অনর্থক। আর কোন ডাক্তারী ব্যাপারে কেউ কোন ইঞ্জিনিয়ারের ফতোয়া মেনেও নেবে না কোন জ্ঞানী।

أعط القوس باريها.

আমাদের এ কাজ যেন ঠিক তাই অনর্থক। আমরা বড় বড় মুফতীদের কথা মেনে নিলেই পারি। অথবা না মানলেও যদি চুপ থাকি তাও কল্যাণ। কিন্তু মুশকিল সেখানেই বাধে যেখানে উভয় পক্ষ থেকে কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি করা হয়।

আমিও 'স্বালাতে মুবাশ্‌শির ﷺ' সালাতে রাসূল ও দুআয়ে রাসূলে যা লিখেছিলাম তাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যখন বড় বড় আন্তর্জাতিক মুহাদ্দিস ও মুফতীদের সুচিন্তিত মতকে অনেকে উন্নাসিকতার সাথে রদ্দ করতে চান এবং বড় দুঃসাহসিকতার সাথে নির্দ্বিধায় কোন প্রকার মুখের দিকে না তাকিয়ে বিনা লজ্জায় তা 'মূর্খামি ও ফিতনা' বলে আখ্যায়িত করেন, তখন আর চুপ

থাকা যায় না।

চুপ থাকা যায় না তখন, যখন একজন হাফেয ও মাওলানা বলেন, 'আমি সারা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াই এবং ছোট থেকে আজ পর্যন্ত দেশ-বিদেশে অনেক মসজিদে নামায পড়েছি, কোথাও মাগরেবের ফরয নামাযের আগে ঐরূপ সুন্নাত নামায পড়তে দেখি নাই। শুধুমাত্র মক্কায় হজ্ব করতে গিয়ে বাইতুল্লা শরিফের মসজিদে লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী নামায পড়ছেন? তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক বললেন, সুন্নাত, কিছু লোক বললেন, নফল, কিছু লোক বললেন, জানি না কী নামায?'

অর্থাৎ, হয়তো বা মক্কা ছাড়া আর কোথাও ঐ নামায হয় না? তিনি নিজে তো আলেম। তাহলে তিনি আবার লোকেদেরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

চুপ থাকা যায় না তখন, যখন কোন প্রসিদ্ধ আলেম বলেন, 'উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসার শিক্ষক ও আমার শিক্ষকগণ মাগরেবের পূর্বে দু' রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন না এবং ফরয নামায পর দোয়া করতেন। এটাই আমার দলীল!'

চুপ থাকা যায় না তখন, যখন কোন সুযোগ্য শায়েখ, মুহাদ্দেস, মুফাসসের মাওলানা বলেন, 'জিনারা এই দোওয়াকে বিদআত বলছেন, তাঁদের নিকট কোন দলীল নেই! পক্ষান্তরে দোওয়ার প্রমাণে পবিত্র কোরআন শরিফে একাধিক দলীল বিদ্যমান!!??'

فإن لله وإن إليه راجعون !

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة * وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

চুপ থাকা যায় না তখন, যখন একজন বড় সালাফী ইদারার ছাত্র ফাযেলে বারানসী 'এই দোওয়া'কে সমর্থন করেন।

চুপ থাকা যায় না তখন, যখন প্রসিদ্ধ বক্তা আলেম মন্তব্য করেন যে, 'ফরয নামায বাদে, যৌথ ও একা হাত তুলে দোয়া করাকে যারা বিদাত বলে তারাই বিদাতী!'

চুপ থাকা যায় না তখন, যখন সত্যানুসন্ধানী যুব-সমাজ আমাকে 'কুলের কথা খুলে বলা'র জন্য বারবার অনুরোধ করছে।

আলোচনার শুরুতে শরয়ী কয়েকটি মূলনীতি জেনে রাখা উচিত,

১। আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না। আর মহানবী ﷺ-এর বিধিবদ্ধ পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে কোন ইবাদত কবুল হবে না।

২। যে কোনও আমল ইখলাস ও তরীকায়ে মুহাম্মাদী ছাড়া আল্লাহর নিকট গৃহীত নয়।

৩। তরীকায়ে মুহাম্মাদী ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে যে কোন ইবাদত বিদআত।

৪। যে কোন ইবাদত মূলতঃ নিষিদ্ধ। কোন ইবাদত প্রমাণের জন্য খাস দলীল চাই। বিনা দলীলের যে কোন ইবাদত বিদআত।

৫। প্রতি সেই ইবাদত বা আমল যার পদ্ধতি ও প্রণালী যয়ীফ অথবা মওযু' (গড়া বা জাল) হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সহীহ বা হাসান হাদীসে বর্ণিত হয়নি, তা করা বিদআত। (অর্থাৎ, ইবাদত সহীহ হলেও যদি তার স্থান, কাল, সংখ্যা বা পদ্ধতি দুর্বল বা জাল হাদীস দ্বারা বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই সহীহ ইবাদতও ঐ বর্ণিত স্থান কাল, সংখ্যা বা পদ্ধতিতে করা বিদআত।)

৬। আম ইবাদতকে খাস করলে পদ্ধতি পাল্টে যায়, বিধায় তা বিদআত হয়। প্রত্যেক সেই ইবাদত যা শরীয়ত সাধারণভাবে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে সে ইবাদতকে কোন স্থান, কাল, গুণ, নিয়ম-পদ্ধতি, সংখ্যা বা কারণ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট করে নিলে তা বিদআতরূপে পরিগণিত হয়। (আহকামুল জানায়েয, আলবানী)

৭। বিদআত প্রমাণ করার জন্য কোন দলীল দরকার হয় না। যেমন 'নাই' প্রমাণ করতে

প্রমাণের প্রয়োজন নেই। 'নাই'-এর প্রমাণ কেবল 'নাই'। পক্ষান্তরে আছে প্রমাণ করতে দলীল লাগে। যদি বলেন, এ ঘরে হাতি নেই। তখন যদি কেউ আপনাকে তার দলীল জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয় আপনি হাসবেন। বলবেন, 'হাতি নেই' তার প্রমাণ হল তা নেই। আপনি আছে বলছেন, তাহলে দেখান।

৮। শরীয়তে 'আহকামে খামসাহ' পঞ্চ-বিধানের যে কোন একটি বিধান অনুযায়ী আমলের মান নির্ণয় হয়ে থাকে। যে আমলের যে মান তাকে তার উর্ধ্বে তোলা অথবা তার নিম্নে নামানো বৈধ নয়।

এই পঞ্চ-বিধান নিম্নরূপ ঃ-

১। ফরয বা ওয়াজেব। যা অবশ্যই করতে হয়, করলে সওয়াব হয় এবং না করলে পাপ হয়।
২। সুন্নত, মুস্তাহাব। যা করা ভাল; যা করলে সওয়াব হয় এবং না করলে পাপ হয় না।
৩। মুবাহ, জায়েয, বৈধ। নিজের লাভ থাকলে করা যায়, না করলেও কোন দোষ নেই।
৪। মকরূহ।যা করা ভালো নয়; যা না করলে সওয়াব হয় এবং করলে পাপ হয় না।
৫। হারাম, অবৈধ। যা অবশ্যই বর্জন করতে হয়, না করলে সওয়াব হয় এবং করলে পাপ হয়।

পক্ষান্তরে বিদআত; যার কোন দলীল নেই। বিদআত জেনেও তা করলে পাপ হয়।

আরো জেনে রাখা উচিত যে, যে জিনিস করতে নিষেধ, বারণ বা বাধা হয়, তাকে বিদআত বলা হয় না; বরং তাকে হারাম বা অবৈধ বলা হয়। অবশ্য যা বিদআত, তা করা অবৈধ।

আরো জ্ঞাতব্য যে, মানুষ যে সকল বিদআত করে থাকে, তা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ঃ মুকাফ্‌ফিরাহ (যা করলে মানুষ কাফের হয়) এবং গায়র মুকাফ্‌ফিরাহ (যা করলে মানুষ কাফের হয়ে যায় না)।

বিতর্কিত হাদীসের ব্যাপারে জ্ঞাতব্য এই যে, অমুক 'সহীহ' বা 'যয়ীফ' বললেই তা শেষ কথা নয়। কারণ একটা হাদীসের বিভিন্ন সূত্র থাকে। সেই সমূহ সূত্র ধরেই শেষ বিচার করেন মুহাক্কেক্ব মুহাদ্দিসগণ। তাঁদের বিচারই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে, যাদের সেই তাহক্বীক্ব ও বিচার করার জ্ঞান নেই। বর্তমান বিশ্বে এই ইলমে দক্ষতা লাভ করেছেন মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী। তাঁর বিচারকেই মেনে নিয়ে উলামাগণ অন্ধানুকরণ নয়; বরং তাঁর অনুসরণ করে থাকেন।

এবারে দুআর ব্যাপারটা বুঝুন ঃ-

১। দুআ।
২। ফরয নামাযের পর দুআ? (সময় দ্বারা নির্দিষ্ট)
৩। হাত তুলে দুআ। (পদ্ধতি দ্বারা নির্দিষ্ট)
৪। ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ? (সময় ও একটি পদ্ধতি দ্বারা নির্দিষ্ট)
৫। হাত তুলে ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী দুআ। (দুটি পদ্ধতি দ্বারা নির্দিষ্ট)
৬। ফরয নামাযের পর হাত তুলে ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী দুআ? (সময় ও দুটি পদ্ধতি দ্বারা নির্দিষ্ট)

নিশ্চয় উপরোক্ত চারটি মসলার জন্য পৃথক পৃথক দলীল জরুরী। এক মসলার দলীল আর এক মসলার সাথে যোগ করে কোন নতুন মসলা প্রমাণ হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ কিয়াম বিদআত। ওঁরা বলেন, বিদআত নয়। দলীল ঃ-

আল্লাহ বলেন, --- হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর উপর দরূদ পড়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।

আল্লাহর নবীর কাছে ফাতেমা এলে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগতম জানাতেন। অতএব দাঁড়িয়ে দরূদ (কিয়াম); বিদআত নয়; সুন্নত।

এইভাবে নবীদিবস পালন করা বিদআত নয়। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি বলে দাও, এ হল তাঁরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা (পার্থিব সম্পদ) সঞ্চয় করছে তা হতে অধিক উত্তম।" *(সূরা ইউনুস ৫৮ আয়াত)*

আর নবী ﷺ সোমবার রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "এটা হল সেই দিন, যেদিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং আমার উপর সর্বপ্রথম কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।"

অতএব মহানবী ﷺ জন্মদিন পালন করেছেন আর আল্লাহ খুশী করতে বলেছেন। তাহলে নবীদিবস পালন করে আনন্দ করা বিদআত হয় কি ক'রে?

যেমন অনেকে বলতে পারেন, মাগরেবের ফরয নামাযের আগে দু' রাকআত নামায বিদআত নয়। কারণ, আল্লাহ বলেন তোমরা নামায পড়। নামায না পড়লে জাহান্নামে যাবে। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বারণ করে - এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে?

মহানবী ﷺ বলেছেন, জান্নাত যেতে চাইলে বেশী বেশী ক'রে নামায পড়।

জ্ঞানী পাঠক অবশ্যই বুঝবেন যে, পৃথক পৃথক বিষয়ের দলীলকে একত্রিত করে অন্য একটা বিষয় প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। যা কেউই মেনে নেবেন না। আর তা বৈধও নয়।

এখন দাবী যদি ১নং হয়, তাহলে কুরআন-হাদীসে প্রচুর দলীল মিলবে। যা ফরয, অপরিহার্য, না করলে জাহান্নাম যেতে হবে।

দাবী ২নং হলেও দলীলের অভাব নেই। যা করতে হবে, করা সুন্নত।

দাবী ৩নং হলেও দলীল পাবেন। তা আম সময়ে করা যাবে। নিজের প্রয়োজনে আম সময়ে হাত তুলে মুনাজাত করা যায়।

দাবী ৪নং হলে দলীল পাবেন, কিন্তু সে সব দলীল দুর্বল, তা নির্ভরযোগ্য নয়, তা দিয়ে ইবাদত প্রমাণ করা যায় না।

দাবী ৫নং হলে তারও দলীল পাবেন। মহানবী ﷺ সাহাবাগণ সহ যেখানে যেভাবে করেছেন সেখানে সেইভাবে করা সুন্নত।

আর দাবী যদি ৬নং হয় তাহলে তার সপক্ষে নির্ভরযোগ্য দলীল মিলা বড়ই দুষ্কর। আর প্রথমেই বলা হয়েছে যে, একটা দাবীর দলীল অন্য দাবীর প্রমাণে মিলিয়ে যৌথভাবে যৌগিক আমল প্রমাণ করায় নতুন শরীয়ত রচিত হতেই থাকবে। আর তাতে বিদআত প্রতিহত হবে না। কারণ এইভাবে প্রচুর ইবাদত আবিষ্কার করা যাবে, আর 'ক্ষতি কি? বাধা কি? বাধা নেই, ভালো জিনিস তো' বলে অনেক নতুন ইবাদত জায়েয বা মুস্তাহাব হয়ে বসবে। আর তা কোনমতেই বাঞ্ছিত নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ সতর্ক করে বলেছেন, "তোমরা (শরীয়তে) সকল নব-আবিষ্কৃত আমল থেকে দূরে থেকো, কারণ প্রত্যেক নব-আবিষ্কৃত আমল বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা।"

তসবীহ-তাহলীল ভালো জিনিস, জামাআতী যিক্‌রের ফযীলতও বর্ণনা করা হয়। একশ' ক'রে তসবীহ ইত্যাদির ফযীলতও বর্ণনা হয়েছে। এই সব মিলিয়ে ফরয নামাযের আগে জামাআতীভাবে বসে একশ' একশ' করে তসবীহ-তাহলীল পড়াকে আপনি কি মনে করেন? বিদআত, না জায়েয?

আপনি যাই বলেন আর না বলেন, ইবনে মাসঊদ ﷺ কি বলেন, তা শুনুন।

আম্র বিন সালামাহ বলেন, ফজরের নামাযের পূর্বে আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ-এর বাড়ির দরজায় বসে থাকতাম। যখন তিনি নামাযের জন্য বের হতেন, তখন আমরা তাঁর সাথে মসজিদে যেতাম। (একদা ঐরূপ বসেছিলাম) ইতিমধ্যে আবু মূসা আশআরী আমাদের নিকট এসে বললেন, 'এখনো কি আবূ আব্দুর রহমান (ইবনে মাসঊদ) বের হন নি?' আমরা বল্লাম, 'না।' অতঃপর তাঁর অপেক্ষায় তিনিও আমাদের সাথে বসে গেলেন। তারপর তিনি যখন বাড়ি হতে বের হয়ে

এলেন, তখন আমরা সকলে তাঁর প্রতি উঠে দন্ডায়মান হলাম। আবূ মূসা আশআরী তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আবু আব্দুর রহমান! আমি মসজিদে এক্ষনি এমন কাজ দেখলাম, যা অদ্ভুত বা অভূতপূর্ব। তবে আলহামদুলিল্লাহ, আমি তা ভালই মনে করি।' তিনি বললেন, 'কি সেটা?' (আবু মূসা) বললেন, 'যদি বাঁচেন তো দেখতে পাবেন; আমি মসজিদে এক সম্প্রদায়কে এক-এক গোল বৈঠকে বসে নামাযের প্রতীক্ষা করতে দেখলাম। তাদের হাতে রয়েছে কাঁকর। প্রত্যেক মজলিসে কোন এক ব্যক্তি অন্যান্য সকলের উদ্দেশ্যে বলছে, একশত বার 'আল্লাহু আকবার' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তকবীর পাঠ করছে। লোকটি আবার বলছে, একশত বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তাহলীল পাঠ করছে। আবার বলছে, একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তসবীহ পাঠ করছে।' তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, 'আপনি ওদেরকে কি বললেন?' আবু মূসা বললেন, 'আপনার রায়ের অপেক্ষায় আমি ওদেরকে কিছু বলিনি।' তিনি বললেন, 'আপনি ওদেরকে নিজেদের পাপ গণনা করতে কেন আদেশ করলেন না এবং ওদের পুণ্য বিনষ্ট না হবার উপর যামানত কেন নিলেন না?'

আম্র বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। তিনি ঐ সমস্ত গোল বৈঠকের কোন এক বৈঠকের সম্মুখে পৌঁছে দন্ডায়মান হয়ে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে একি করতে দেখছি?' ওরা বলল, 'হে আবু আব্দুর রহমান! কাঁকর, এর দ্বারা তকবীর, তহলীল ও তসবীহ গণনা করছি।' তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের পাপরাশি গণনা কর, আমি তোমাদের জন্য যামিন হচ্ছি যে, তোমাদের কোন পুণ্য বিনষ্ট হবে না। ধিক্ তোমাদের প্রতি হে উম্মতে মুহাম্মাদ! কি সত্বর তোমাদের ধ্বংসের পথ এল! তোমাদের নবীর সাহাবাবৃন্দ এখনও যথেষ্ট রয়েছেন। এই তাঁর বস্ত্র এখনো বিনষ্ট হয়নি। তাঁর পাত্রসমূহ এখনো ভগ্ন হয়নি। তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা এমন মিল্লাতে আছ যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মিল্লাত অপেক্ষা শ্রেষ্টতর অথবা তোমরা ভ্রষ্টতার দ্বার উদ্‌ঘাটনকারী?!' ওরা বলল, 'আল্লাহর কসম, হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা ভালরই ইচ্ছা করেছি।' তিনি বললেন, 'কিন্তু কত ভালোর অভিলাষী ভালোর নাগালই পায় না! অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, "এক সম্প্রদায় কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তাদের ঐ পাঠ (তেলাঅত) তাদের কণ্ঠ অতিক্রম করবে না।" আর আল্লাহর কসম! জানি না, সম্ভবতঃ তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য হতে।'

অতঃপর তিনি সেখান হতে প্রস্থান করলেন। আম্র বিন সালামাহ বলেন, 'নহরওয়ানের দিন ঐ বৈঠকসমূহের অধিকাংশ লোককেই খাওয়ারেজদের সাথে দেখে ছিলাম। যারা আমাদের (হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবাদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়ছিল।' *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২০০৫নং)*

বুঝা গেল এই যে, কোন আম ইবাদত ইচ্ছামত সময় ও পদ্ধতিতে করা যায় না; যদি না সে পদ্ধতি শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

দুআর ব্যাপারে সঊদী আরবের ফক্বীহ ও দ্বিতীয় মুফতী শায়খ ইবনে উষাইমীন বলেন,

ولا شك أن الدعاء من العبادة وأنه مشروع كل وقت لكن يجب أن يعرف الفرق بين العموم والخصوص، فتقييد العام بشيء معين من زمان، أو مكان، أو حال، أو عمل يحتاج إلى دليل، فإذا قلنا يسن الدعاء بعد الصلاة؛ لأن الدعاء مشروع كل وقت، قلنا: يحتاج في تقييده بعد الصلاة إلى دليل.

ولو قال قائل: يسن للآكل إذا فرغ من أكله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة عليه مشروعة كل وقت، قلنا: هذا يحتاج إلى دليل.

ولو قال قائل: يسن لمن فرغ من قضاء حاجته أن يذكر الله تعالى بالتهليل، والتسبيح؛ لأنه مشروع كل وقت. قلنا: تقييده بذلك يحتاج إلى دليل، وهلم جرا. فافهم هذه القاعدة فإنها مفيدة جداً.

অর্থাৎ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দুআ অন্যতম ইবাদত; যা সব সময়কার জন্য বিধিবদ্ধ।

কিন্তু আম-খাসের মাঝে পার্থক্য বুঝা জরুরী। সুতরাং আম ইবাদতকে নির্দিষ্ট কোন কাল, স্থান, অবস্থা অথবা আমল দ্বারা খাস করার দলীল প্রয়োজন। যদি বলি, নামাযের পর দুআ সুন্নত; যেহেতু দুআ সকল সময়ে বিধেয়। বলব যে, নামাযের পর (সময়ের) সাথে দুআকে খাস করার দলীল দরকার।

যদি কেউ বলে, খাওয়ার পর আল্লাহর নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়া সুন্নত। কেননা, তাঁর উপর দরূদ পড়া সকল সময়ে বিধেয়। তাহলে আমরা বলব, এর জন্য দলীল দরকার।

যদি কেউ বলে, পায়খানা-পেশাব করার পর তসবীহ-তাহলীল দ্বারা মহান আল্লাহর যিক্র করা সুন্নত। কেননা, যিক্র সকল সময়ে বিধেয়। তাহলে আমরা বলব, এই নির্দিষ্টীকরণের জন্য দলীল প্রয়োজন। অনুরূপ আরো বহু ইবাদতের ব্যাপারে এই কথাই প্রযোজ্য। এই নীতি বুঝে নিন, যেহেতু এটি বড় উপকারী। (আল-ফিক্বহ ৭/২০৭)

এবার বলবেন, আমাদের কাছে আমাদের দাবীর দলীল আছে। তা না থাকলে অমুক জাঁদরেল আলেম তা করবেন কেন? করে যাবেন কেন?

কারণ, হতে পারে সে প্রমাণ সহীহ নয়। অথবা যাঁকে আপনি 'জাঁদরেল' ভাবছেন তিনি আসলেই তা নন। তাছাড়া তাঁর থেকেও বড় জাঁদরেল যদি তা না করেন, তাহলে আপনি কি বলবেন?

যদি বলেন, বাংলার অমুক অমুক বাঘা আলেম, তাঁরা কি তাহলে কুরআন-হাদীস বুঝেন না?

তাহলে আমরা বলব, আরবের অমুক অমুক বাঘা আলেম, তাঁরা কি তাহলে কুরআন-হাদীস বুঝেন না? নাকি তাঁরা আরবীই বুঝেন না?

যাঁরা ফরয নামাযের পর নিয়মিত মুনাজাত করে গেছেন তাদের কি হবে? **'তাহলে তাঁরা কি জাহান্নামে যাবেন ইব্রাহীমের পিতা আযরের মত?'**

না, এর জন্য অবশ্যই নয়। কারণ, ইব্রাহীমের পিতা মুশরিক ছিলেন, আর তাঁরা তা ছিলেন না। তাঁরা না জেনে ভুল করে গেছেন অথবা সুন্নত ভেবে তা করে গেছেন, তাতে তাঁরা গোনাহগার তো হবেনই না; বরং একটি নেকীরও অধিকারী হতে পারেন।

তাহলে আমরা যাব কোথা? কার কথা মানব?

যাকে আপনি ভালো মনে করেন, তার কথা মানেন। বাঙালী, হিন্দী, স্বদেশের স্বঘোষিত মুফতী অথবা সউদী নির্বাচিত মুফতী, যে মুফতীকে আপনার বড় মনে হয়, তাঁর কথা মানেন। যার মধ্যে ভুলের আশঙ্কা কম মনে করেন, তার কথা মানেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ } (١٧-١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ,অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে - যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। (সূরা যুমার ১৭- ১৮ আয়াত)

তা সত্ত্বেও যদি তার কথা ভুল হয়?

তবুও কোন ক্ষতি নেই। আপনি বেঁচে যাবেন। তবে হক সন্ধানের চেষ্টা অবশ্যই রাখতে হবে।

যদি ফরয নামাযের পর হাত তুলে ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী দুআর ব্যাপারেই বলেন, তাহলে আসুন! বর্তমান বিশ্বের বড় বড় মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফতীদের মতামত শুনাই ঃ-

আমাদের দেশের মত পাড়ায় পাড়ায় বা মসজিদে মসজিদে ফতোয়াবাজি করার মত বা তা মানার মত মানসিকতা সউদী আরবে নেই। সেখানে মুফতীগণের স্থায়ী কমিটি আছে এবং তার প্রধান মুফতী আছেন। সেই কমিটির ফতোয়া নিম্নরূপ ঃ-

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٩٠١)

س١: هل الدعاء بعد صلاة الفرض سنة وهل الدعاء مقرون برفع اليدين وهل ترفع مع الإمام أفضل أم لا ؟

ج١: ليس الدعاء بعدالفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، أما الدعاء بدون ذلك فلابأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبدالله بن قعود (عضو)، عبدالله بن غديان (عضو)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)

৩৯০১নং ফতোয়ার প্রথম প্রশ্ন।

প্রশ্ন নং ১। ফরয নামাযের পর দুআ কি সুন্নত? এই দুআ কি দুই হাত তুলে করতে হবে? ইমামের সাথে হাত তুলা উত্তম কি না?

উত্তর নং ১। ফরয নামাযসমূহের পর দুআ সুন্নত নয়; যদি তা হাত তুলে হয়। তাতে তা ইমাম একাকী হোক, অথবা মুক্তাদী একাকী হোক অথবা ইমাম-মুক্তাদী মিলে হোক। বরং এটি বিদআত। যেহেতু (এই আমল) নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবা ﷻ থেকে বর্ণিত হয়নি। পক্ষান্তরে হাত না তুলে দুআ (যিক্‌র) করায় কোন ক্ষতি নেই। যেহেতু এ ব্যাপারে কিছু হাদীস এসেছে। আর আল্লাহই তওফীকদাতা---।

ইলমী তথ্যানুসন্ধান ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, আব্দুল্লাহ বিন কুঊদ (সদস্য), আব্দুল্লাহ বিন গুদাইয়ান (সদস্য), আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (প্রধান)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٥٦٥)

س٤: رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات الخمس هل ثبت رفعها من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وإذا لم يثبت هل يجوز رفعهما بعد الصلوات الخمس أم لا؟

ج٤: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه رفع يديه بعد السلام من الفريضة في الدعاء، ورفعهما بعد السلام من صلاة الفريضة مخالف للسنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود (عضو) عبد الله بن غديان (عضو) عبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

৫৫৬৫নং ফতোয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর হাত তুলে দুআকে সুন্নত-পরিপন্থী বলা হয়েছে। (ফাতাওয়াল লাজনাহ ৯/১১৫)

الفتوى رقم (٥٧٦٣)

س: نرى في بعض المساجد أن الإمام إذا فرغ من صلاته المفروضة يرفع يديه بالدعاء ويقتدي به المأمومون في هذا، هل ورد في هذا شيء من الكتاب والسنة، وما حكم من زعم أن ذلك واجب لابد منه أرجو إفادتي؟

ج: لا نعلم أصلا شرعيا يدل على مشروعية ما ذكرته في السؤال من أن الإمام إذا فرغ من صلاته المفروضة يرفع يديه بالدعاء ويقتدي به المأمومون في هذا، وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود (عضو) عبد الله بن غديان (عضو) عبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج ٩ / ص ١١٤)

ফতোয়া নং ৫৭৬৩।

প্রশ্ন ঃ কিছু মসজিদে দেখতে পাই, ইমাম ফরয নামায শেষ করলে দুই হাত তুলে দুআ করেন এবং মুক্তাদীরা তাতে তার অনুসরণ করে। এ ব্যাপারে কি কিতাব ও সুন্নাহতে কোন বিধান এসেছে? আর সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বিধান কি, যে মনে করে অনুরূপ দুআ (মুনাজাত) ওয়াজেব ও জরুরী? আশা করি উত্তর দিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর ঃ প্রশ্নে যে আমলের উল্লেখ আপনি করেছেন, অর্থাৎ ইমাম ফরয নামায শেষ করলে হাত তুলে দুআ করেন এবং মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করে, এর বৈধতার ভিত্তি শরীয়তে আছে বলে জানি না। আর নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে যে, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪০নং) "যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম ১৭১৮নং)

আর আল্লাহই তওফীকদাতা---।

ইলমী তথ্যানুসন্ধান ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, আব্দুল্লাহ বিন কুঊদ (সদস্য), আব্দুল্লাহ বিন গুদাইয়ান (সদস্য), আব্দুর রায্যাক আফীফী (উপপ্রধান), আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (প্রধান)।

আল্লামা শায়খ ইবনে উষাইমীন বলেন,

الدعاء بعد الفريضة ليس بسنة، ولا ينبغي فعله، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل: الاستغفار ثلاثاً بعد السلام، والذي ينبغي للإنسان المصلي أن يدعو وهو في صلاته، إما في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"، ولقوله: "وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم"، أي حريّ أن يستجاب لك.

وأما في آخر التشهد قبل السلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذكر التشهد قال: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء"، وأمر المصلي إذا تشهد التشهد الأخير "أن يتعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال". و لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه بالدعاء بعد كل فريضة حتى الاستغفار ثلاثاً و لم ينقل عنه أنه كان يرفع يديه فيه.

وليس هناك دعاء يسمى دعاء ختم الصلاة بل المأمور به بعد الصلاة ذكر الله، قال الله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ).

وتوجيهي لمن يدعو الله تعالى عقب كل فريضة رافعاً يديه أن يترك ذلك اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكاً بهديه، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الفقه لابن عثيمين رحمه الله - (ج ٧ / ص ٢٠٨)

ফরয নামাযের পর দুআ সুন্নত নয়। তা করাও উচিত নয়। অবশ্য যে দুআ করার ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে হাদীস এসেছে (তা করা বিধেয়)। যেমন, সালাম ফিরার পর ৩ বার ইস্তিগফার ইত্যাদি। নামাযীর উচিত, নামাযের ভিতর দুআ করা। হয় সিজদাতে, যেমন নবী ﷺ বলেন, "বান্দা যখন সিজদায় থাকে, তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়।" তিনি আরো বলেন, "সিজদায় তোমরা বেশী বেশী দুআ কর। কারণ তা কবুলযোগ্য।"

না হয় তাশাহহুদের শেষে সালাম ফিরার আগে দুআ করা উচিত। যেহেতু নবী ﷺ তাশাহহুদ পড়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, "তারপর ইচ্ছামত দুআ করবে।" তিনি নামাযীকে শেষ তাশাহহুদে বসে জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাইতে আদেশ করেছেন। আর নবী ﷺ নিজে প্রত্যেক নামাযের পর দুআর জন্য হাত তুলতেন না। এমনকি তিনবার ইস্তিগফারেও হাত তুলতেন বলে কোন বর্ণনা নেই।

'খাতমুস স্বালাহ' বলে কোন দুআ নেই। বরং নামাযের পর বাঞ্ছিত হল আল্লাহর যিক্র। মহান আল্লাহ বলেন,

(فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم).

তারপর যখন তোমরা নামায শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। *(সূরা নিসা ১০৩ আয়াত)*

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর হাত তুলে আল্লাহর কাছে দুআ করে, তার প্রতি আমার উপদেশ এই যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করে এবং তাঁর আদর্শ অবলম্বন করে সে যেন এ আমল ত্যাগ করে। যেহেতু মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদর্শই উত্তম আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ যা অভিনব। (আল-ফিক্বহ ৭/২০৮)

মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী বলেন,

وجملة القول: إنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه بعد الصلاة إذا دعا، وأما دعاء الإمام وتأمين المصلين عليه بعد الصلاة ــ كما هو المعتاد اليوم في كثيرٍ من البلاد الإسلامية ــ فبدعة لا أصل لها كما شرح ذلك الإمام الشاطبي في "الاعتصام" شرحاً مفيداً جداً لا أعرف له نظيراً، فليراجع من شاء البسط والتفصيل.

মোটের উপর কথা এই যে, নবী ﷺ কর্তৃক এ প্রমাণিত নয় যে, তিনি নামাযের পর যখন দুআ করতেন, তখন হাত তুলতেন। পক্ষান্তরে বাদ নামায ইমামের দুআ করা ও তার উপর মুক্তাদীদের 'আমীন-আমীন' বলা -যেমন বর্তমানে বহু ইসলামী দেশে প্রচলিত -তা বিদআত; তার কোন ভিত্তি নেই। যেমন এ বিষয়টিকে ইমাম শাত্বেবী তাঁর 'আল-ই'তিস্বাম' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা অত্যন্ত উপকারী, যার কোন নযীর আমার জানা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি বিস্তারিত জানতে চায়, সে ঐ গ্রন্থের প্রতি রুজু করুক। (সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৫৪৪নং)

এঁরা কি করে বলেন যে কোন প্রমাণ নেই? তাহলে এঁরা কি বুখারী শরীফের ৪৫টি ও মুসলিম শরীফের ৩৫টি শারাহ দেখেননি বা পড়েননি? তাঁরা তিরমিযীর শারাহ 'কূউওয়াতুল মুগতাযী' (?!) (সঠিক নাম ঃ কূতুল মুগতাযী), 'তোহফাতুল আহবুযী' (?!) (সঠিক নাম ঃ তুহফাতুল আহওয়াযী) এবং 'আল্কাওয়াকিবুদ দুর্রীয়ো' (?!) ইত্যাদি চোখ খোলা ও মন গলানোর কিতাব ওঁরা পড়েছেন আর এঁরা কি পড়েননি?

প্রমাণ না থাকলে ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী দুআর পক্ষপাতী হুযুররা যে সব দলীল পেশ করে থাকেন, তা কি?

যে দলীল আমাদের হুযুররা পেশ করে থাকেন, তার ব্যাপারে শুনুন ঃ-

সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী' ('আহবুযী' নয়)। যিনি এই গ্রন্থের লেখক, সেই মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান সাহেব মুবারকপুরী ফরয নামাযের পর জামাআতী মুনাজাতের একজন পথিকৃৎ। আর ইনিই হলেন মুনাজাতের পক্ষপাতীদের বড় দলীল। অবশ্য তিনি 'জায়েয' বলেছেন, তাও কোন্ সামগ্রিক চিন্তার অনুভূতিতে অনুধাবন করে তা পাঠকের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

১। তফসীর ইবনে কাষীর থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আবূ হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ সালাম ফিরার পর নিজ হাত দুটিকে তুলে ক্বিবলামুখী হয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি অলীদ ----কে কাফেরদের কবল থেকে মুক্তি দাও ---।

অনুরূপ আছে তফসীর ত্বাবারীতে।

উক্ত হাদীস নকল করার পর মুবারকপুরী বলেন,

قُلْت : وَفِي سَنَد هَذَا الْحَدِيث عَلِيُّ بْنُ زَيْد بْن جَدْعَانَ وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيه.

অর্থাৎ, এই হাদীসের সনদে আলী বিন যায়দ বিন জাদআন রয়েছেন, আর তিনি একজন

বিতর্কিত ব্যক্তি। (ইবনে হাজার এঁকে 'যয়ীফ' বলেছেন। তাক্বরীবুত তাহযীব)

সুতরাং (ক) হাদীসটি সহীহ নয়; যয়ীফ। এ দ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না।

(খ) পক্ষান্তরে এই হাদীসই বুখারী-মুসলিমে নিম্নরূপ আছে,

عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال : " سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد : اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف " يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته : " اللهم العن فلانا وفلانا" لأحياء من العرب حتى أنزل الله : {ليس لك من الأمر شيء}. متفق عليه.

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন কারো জন্য দুআ অথবা বদ্দুআ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি রুকূর পরে কুনূত পড়তেন। তিনি বলতেন, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা অলাকাল হামদ, হে আল্লাহ তুমি অলীদকে --- মুক্তি দাও।" (বুখারী, মুসলিম)

সুতরাং যয়ীফ হাদীসে বলছে, তিনি সালাম ফিরার পর দুআ করেছেন। পক্ষান্তরে বুখারী-মুসলিমের হাদীস বলছে, ঐ দুআ রুকুর পর করেছেন। আপনি কোন্ হাদীসকে মানবেন?

২। সুয়ূত্বীর 'ফাযযুল বিআ' থেকে নকল করেছেন, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহয়্যা আসলামী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে দেখলাম, তিনি একজনকে দেখলেন নামায শেষ করার আগেই হাত তুলে আছে। সুতরাং সে যখন নামায শেষ করল, তখন তিনি তাকে বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ না করে হাত তুলতেন না। (ত্বাবারানী)

(ক) এখানে স্পষ্ট নয় যে, কোন্ নামায ছিল; ফরয না নফল?

(খ) এর দ্বারা নামায শেষে সালাম ফিরে হাত তুলে দুআ প্রমাণ হয়, কিন্তু ফরয নামাযের পর হাত তুলে ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী দুআ প্রমাণ হয় না।

(গ) 'হাফেয হাইষামী বলেছেন, রিজালুহু সিকাতুন, এর বর্ণনাকারীরা বিশুদ্ধ।' কিন্তু তবুও হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ রিজাল সিকাত হলেই হাদীস সহীহ হয় না। কারণ একজন সিকাহ বললে রাবী তাঁর নিকট সিকাহ, কিন্তু অপরের নিকট যয়ীফ হওয়ার কথা ধরা পড়লে আসলে রাবী যয়ীফ হন। এই জন্য আল্লামা আলবানী বলেন,

وقال الهيثمي: ورجاله ثقات. قلت وفيه نظر من وجهين.

ইবনে মায়ীন বলেছেন, ফুযাইল ليس بثقة হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, صدوق له خطأ كثير যাহাবী বলেছেন, فيه لين সুতরাং হাদীসটি যয়ীফ। (বিস্তারিত দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৫৪৪নং)

৩। আসওয়াদ আমেরী পিতার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়লাম। তিনি যখন সালাম ফিরে মুক্তাদীদের দিকে সামনা-সামনি মুখ ফিরালেন, তখন তিনি তাঁর দুটি হাত তুলে দুআ করলেন।

মুবারকপুরী (রঃ) যে হাদীস নকল করেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ-

حَدِيثُ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا الْحَدِيثَ.

অতঃপর তিনি বলেছেন,

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِه، كَذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْأَعْلَامِ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ سَنَدٍ وَعَزَاهُ إِلَى الْمُصَنِّفِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِه فَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ ضَعِيفٌ .

অর্থাৎ, এটি রেওয়ায়েত করেছেন ইবনু আবী শাইবাহ। কিছু বড় বড় উলামা এই হাদীসকে বিনা সনদে মুসান্নাফের হাওয়ালায় এইরূপই উল্লেখ করেছেন। আমি তার সনদ সম্পর্কে জানতে পারিনি। সুতরাং আল্লাহই ভালো জানেন, তা সহীহ অথবা যয়ীফ?

বুঝা গেল যে, মুবারকপুরী (রঃ)এর লাইব্রেরীতে মুসান্নাফ গ্রন্থটি ছিল না। বিধায় তিনি অপরের কাছ থেকে নকল করেছেন এবং জানতেন না যে, তা সহীহ অথবা যয়ীফ।

আপনার কাছে যদি মুসান্নাফ থাকে, তাহলে খুলে দেখে নিন। তাতে এরূপ রয়েছে,

حدثنا هشيم قال : نا يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد الأسود العامري عن أبيه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم انحرف.(؟؟؟؟)

অর্থাৎ, আসওয়াদ আমেরী পিতার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়লাম। সুতরাং তিনি যখন সালাম ফিরলেন তখন মুক্তাদীদের দিকে সামনা-সামনি মুখ ফিরালেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ১/৩৩৭)

বুঝতেই পারছেন, হাদীস সহীহ হোক অথবা যয়ীফ, তাতে وَرَفَعَ يَدَيْه وَدَعَا তখন তিনি তাঁর দুটি হাত তুলে দুআ করলেন। এ বাক্য নেই। সুতরাং এ দলীলটাও ভুয়া!

৪। আল্লাহর রসূল ﷺ সবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিচ্ছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، تَشَهُّدٌ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشُّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْك، يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّك مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَك وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلَكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا ، وَفي رِوَايَة : فَهُوَ خِدَاجٌ.

(নামায হচ্ছে দু' রাকআত দু' রাকআত। প্রত্যেক দু' রাকআতে রয়েছে তাশাহহুদ ----) যখন (নামায পড়ে শেষ করে সালাম ফিরবে) তারপর তোমার প্রয়োজনের জন্য হাত তুলে (আল্লাহর সমীপে) বলবে, হে আমার রব্ব!--- কেউ যদি এ রকম না বলে, না করে (নামাযের ভিতরে যা যা বলেছে) তা নাকেস, তা অসম্পূর্ণ।

(ক) খেয়াল করুন যে, বিষয়টি কিন্তু নফল বা বিত্র নামাযের। অথচ তা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এখানে জামাআতের কথাও নেই।

(খ) হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় সালাম ফিরার পর কেউ যদি হাত তুলে মুনাজাত না করে, তাহলে তার নামায অসম্পূর্ণ। যেমন সূরা ফাতিহা না পড়লে যা হয়! আপনি কি মনে করেন?

(গ) হাদীসের ইবারতে কিন্তু সালাম ফিরার কথা নেই। (ওটি ব্যাখ্যাতার কথা।) সেই জন্য আল-ইরাক্বী বলেছেন, হতে পারে যে, এখানে হাত তোলা বলতে ফজরের নামাযের ক্বুনূতে অথবা বিত্র নামাযের ক্বুনূতে। (আউনুল মা'বূদ ৩/২৪৬)

(ঘ) হাদীসের ব্যাখা বা সাহিত্যায়ানা আলোচনার পর মুবারকপুরী বলেছেন,

قُلْت : مَدَارُ هَذَا الْحَديث عَلَى عَبْد اللَّه بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ وَهُوَ مَجْهُولٌ عَلَى مَا قَالَ الْحَافظُ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَمْ يَصِحَّ حَديثُهُ وَذَكَرَهُ ابْنُ حبَّانَ في الثِّقَات .

আমি বলি, এ হাদীসটির নির্ভরস্থল হল, আব্দুল্লাহ বিন নাফে' বিন আমইয়া। আর সে অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী; যেমন হাফেয বলেছেন। বুখারী বলেছেন, তার হাদীস সহীহ নয়। আর ইবনে হিব্বান তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এই হল মুহাদ্দিসের আমানতদারী। অন্ততঃপক্ষে নিজে সহীহ-যয়ীফ জানতে না পারলেও অপরের কথা নকল করে দেবেন। এটাকেই বলে, আমানাহ ইলমিয়্যাহ।

সুতরাং হাদীস যে সহীহ নয়, তা বুঝতেই পারছেন। এ যুগের মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী বলেছেন, যয়ীফ। (যয়ীফ তিরমিযী, যয়ীফুল জামে' ৩৫১২নং, মিশকাত ৮০৫নং)

আর ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআর কোন হাদীস সহীহ নয় বলেই অপর পক্ষের সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ ঐ দুআকে বিদআত বলেছেন।

আর ঐ দুআর খাস দলীল নেই বলেই তো ফরয নামাযের পর মুনাজাতের পক্ষপাতীগণ আরো অন্যান্য দলীল পেশ করে বলেন,

(ক) হাদীসে আমভাবে হাত তুলে দুআর ফযীলত এসেছে।

(খ) ফরয নামাযের পরে দুআর তারগীব এসেছে। আল্লাহর নবী ﷺ ফরয নামাযের পর দুআ করেছেন ও করতে বলেছেন।

(গ) হাত তুলে দুআ করা দুআর একটি আদব। আল্লাহর নবী ﷺ হাত তুলে অনেক দুআ করেছেন।

(ঘ) ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং যয়ীফ হাদীসে হাত তুলে দুআর কথা এসেছে। (আর ফাযায়েলে আমালে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করা যায়।) ইত্যাদি।

এরপর মুবারকপুরী (রঃ) বলেন,

قَالُوا فَبَعْدَ ثُبُوت هَذه الْأُمُور الْأَرْبَعَة وَعَدَم ثُبُوت الْمَنْعِ لَا يَكُونُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَة بِدْعَةً سَيِّئَةً بَلْ هُوَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ عَلَى مَنْ يَفْعَلُهُ.

অর্থাৎ, ফরয নামাযের পর মুনাজাতের পক্ষপাতীগণ বলেন, সুতরাং এই চারটি জিনিস প্রমাণের (?) পর এবং নিষেধ প্রমাণ না থাকার কারণে ফরয নামাযের পর দুআর জন্য হাত তোলা নিকৃষ্ট বিদআত হবে না। বরং তা জায়েয, যে করবে তার কোন দোষ হবে না।

এর কিছু পর মুবারকপুরী (রঃ) তাঁদের রায়ে রায় মিলিয়ে বলেন,

قُلْت : الْقَوْلُ الرَّاجِحُ عِنْدِي أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاة جَائِزٌ لَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

অর্থাৎ, আমার নিকট 'রাজেহ' (প্রাধান্যযোগ্য অভিমত) এই যে, নামাযের পর দুআর জন্য হাত তোলা জায়েয। যদি কেউ করে, তার দোষ হবে না ইন শাআল্লাহু তাআলা। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

এখানে খেয়াল করুন যে, এখানে যৌগিকভাবে যা প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে এবং যা সঠিক মত বলে ব্যক্ত করা হয়েছে তা হল, নামাযের পর দুআর জন্য হাত তোলা জায়েয। এখানে কিন্তু অতিরিক্ত জামাআতী মুনাজাতকে প্রমাণ করে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। যেহেতু তার কোন দলীল নেই।

মুবারকপুরী সাহেব 'জায়েয' বলেছেন, মুস্তাহাব বা সুন্নত নয়। কিন্তু আল্লাহর নবী ﷺ থেকে প্রমাণ থাকলে তো সুন্নত বা মুস্তাহাব হওয়ার কথা। তাই নয় কি? তাহলে এত বড় একজন মুহাদ্দিস এহতিয়াতের সাথে কেবল 'জায়েয' বললেন কেন? কেবল 'নামাযের পর দুআর জন্য হাত তোলা' জায়েয বললেন কেন? পরিষ্কারভাবে বিতর্কিত জামাআতী মুনাজাতকে 'সুন্নত, মুস্তাহাব' বা কমসে কম 'জায়েয' বললেন না কেন? দলীলে মজবুতি নেই বলেই তো? একজনের মাথা, একজনের পা, অপর জনের হাত জুড়ে তৈরী দেহ বলেই তো?

তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে, নিষেধ না থাকলেই যে কোন ইবাদত যে কোন সময় করা যাবে, তা নয়। তাহলে তো অনেক নতুন নতুন ইবাদত আবিষ্কার করা যাবে। এই ধরুন ঃ-

(ক) আযান ও ইকামতের মাঝে হাত তুলে জামাআতী দুআ মুস্তাহাব হবে।

(খ) জুমআর দিনের যে কোনও একটি সময়ে দুআ কবুল হয়, সে সময়েও হাত তুলে জামাআতী দুআ করা মুস্তাহাব হবে।

(গ) সফর অবস্থায় অনুরূপ দুআ মুস্তাহাব।

(ঘ) রোযা অবস্থায় অনুরূপ দুআ মুস্তাহাব।

(ঙ) বৃষ্টি বর্ষণের সময় অনুরূপ দুআ মুস্তাহাব। ইত্যাদি।

যেহেতু উক্ত সময়গুলিতে দুআ কবুল হয়, হাত তোলা দুআর একটি আদব, জামাআতী দুআ কবুল হয়ে থাকে এবং ঐ সময় হাত তুলে দুআ করতে নিষেধ নয়।

আশা করি তা কেউ বলবেন না।

৫। জামাআতী মুনাজাতের প্রমাণে আরো দলীল পেশ করে বলা হয়েছে যে, সমস্ত নামায বাদে

ইজতেমায়ী দোয়া না করে একা একা করা হলে দোয়া ত্যাগকারীকে শাস্তি দেওয়া হয়। দোয়া ত্যাগকারীর উপর থেকে ওযর-আপত্তি মেনে নেওয়া হয় না। (তিরমিযীর শারাহ কাওয়াকেবুদ্দরীয় (?) ২৯১পৃঃ)

'শাস্তি দেওয়া হয়', 'শাস্তি দেওয়া হবে' নয়। তার মানে হয়তো দুনিয়াতেই এই শাস্তি মুনাজাতের পক্ষপাতী কোন শাসক দিয়ে থাকবেন। অথবা খোদ 'কাওয়াকেবুদ্দরীয়'-ওয়ালাই দিয়ে থাকবেন। নচেৎ মহান আল্লাহ এ শাস্তি দুনিয়াতে বা আখেরাতে দিলে তার দলীল পেশ করা হত।

৬। 'দোয়া করা অবস্থায় ইমাম (মুক্তাদীদেরকে) তালীম দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে শ্রবণযোগ্য দোয়া করবে। (ফাতহুল বারী ? খণ্ড ২৬৯পৃঃ)'

জানাযার নামাযের দুআ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সশব্দে পড়া জায়েয। যেমন নবী ﷺ কোন কোন সময়ে তা পড়েছেনও। অনুরূপ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফরয নামাযের পর 'যিক্র' সশব্দে পড়া বৈধ। ইমাম বুখারী 'নামাযের পর যিক্র' বাবে ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে, ফরয নামাযের সালাম ফিরার পর সশব্দে যিক্র পাঠ নবী ﷺ-এর যুগে ছিল। তারই ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার বলেন,

والمختار : أَنَّ الْإِمَام وَالْمَأْمُوم يُخْفِيَان الذِّكْرَ إِلَّا إِنْ احْتِيجَ إِلَى التَّعْلِيم.

অর্থাৎ, পছন্দনীয় অভিমত হল, ইমাম ও মুক্তাদী নিঃশব্দে যিক্র পাঠ করবে। অবশ্য যদি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে (সশব্দে পড়বে)।

এবার বলুন, ঐ উদ্ধৃতি কি ফরয নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী মিলে মুনাজাত করার দলীল হতে পারে? ঐ শ্রেণীর নকল কি ধোকা দিয়ে নিজের মত প্রমাণ করার প্রয়াস নয়?

৭। 'আরো জানা যায়, (ঐরূপ দোয়া) ফরয নামায বাদে দোয়ায় হাত তুলা নিষেধের হাদিস সাবেত বা সাব্যস্ত নয়। বরং ঐরূপ দোয়া না করার যত হাদীস এসেছে তা সব যায়ীফ। তোহ্ফাতুল আহবুযী ২৪৬ পৃঃ ৯ লাইন।'

এবার আরবী ইবারত পড়ুন ঃ-

وَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْمَنْعُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، بَلْ جَاءَ فِي ثُبُوتِـــه الْأَحَادِيـــثُ الضِّعَافُ.

মুবারকপুরী (রঃ) কি ঐ কথাই বলতে চেয়েছেন? নাকি বলতে চেয়েছেন, 'ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং তার প্রমাণে যয়ীফ হাদীসসমূহ এসেছে।'

এটা কি আরবী ইবারত বুঝার ভুল নয়? তার মানে কি এই নয় যে, 'ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআর সমস্ত হাদীস যয়ীফ' এ কথা দুআর পক্ষপাতীরাও স্বীকার করেন?

ঐ 'দোয়া না করার বা মানা করার হাদীস' এলে তো দুআ 'বিদআত' থাকত না। বরং তা করা 'হারাম' বলা হত। আর তাহলে তো অনেক হুজুর নিষেধ হওয়ার প্রমাণে দলীল চাইতেন না।

বাকী থাকল সেই সকল আম হাদীস যার দ্বারা হাত তুলে দুআ প্রমাণ হয়, কিন্তু ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ প্রমাণ হয় না, যেমন প্রমাণ হয় না জামাআতী মুনাজাত।

১। একদা সাহাবাগণ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে কোন্ সময় দুআ অধিকরূপে কবুল হয় - সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, "গভীর রাতের শেষাংশে এবং সকল ফরয নামাযের পশ্চাতে।" *(তিঃ ৩৪৯৯, নাঃ আমালুল ইয়াউমি অল্লাইলাহ ১০৮নং, মিঃ ৯৬৮ নং)* হাদীসটি অনেকের নিকট দুর্বল।

(ক) এ হাদীসে 'দুবুর' শব্দের অর্থ পশ্চাতে না পরে তা নিয়ে মতভেদ আছে। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর অন্যান্য হাদীস দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করা কর্তব্য। পুস্তিকার প্রথমাংশে তা দেখে নিন।

(খ) এতে হাত তুলে দুআর কথা নেই এবং জামাআতী মুনাজাতের কথাও প্রমাণ হয় না।

২। "নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত

তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন।" *(আবুদাউদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/৫৫৭)*

এ হাদীসে ফরয নামায বাদে হাত তুলে দুআর কথা নেই। এতে জামাআতী মুনাজাতও প্রমাণ হয় না। বরং এখানে একক বান্দার কথা আছে।

৩। নবী ﷺ দোউসের জন্য দুআ করার সময় হাত তুলে দুআ করেছেন।

কিন্তু নামাযের পরের কথা নেই। তাছাড়া বুখারী-মুসলিমে হাত তোলার কথা নেই।

পরন্তু 'তোফায়েল ইবনে উমার' নয়; বরং তুফাইল বিন আম্র যে হাদীস বর্ণনা করেন 'তাতে আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ হাত তুলে দোয়া করে বললেন - হে আমার পালনকর্তা আল্লা, দোউসের দুটি ছেলে সহ তাদের বাখশাশ বা ক্ষমা করো।'

وَحَديثُ جَابر أَنَّ الطُّفَيْلَ ابْنَ عَمْرو هَاجَرَ فَذَكَرَ قصَّةَ الرَّجُل الَّذي هَاجَرَ مَعَهُ وَفيه فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ وَليَدَيْه فَاغْفرْ، وَرَفَعَ يَدَيْه ، وَسَنَدُهُ صَحيحٌ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌ.

(ক) এখানেও ফরয নামাযের পরের কথা নেই।

(খ) মুসলিম শরীফে কি হাত তোলার কথা আছে?

(গ) হাদীসে কি ছেলে সহ তাদের 'বাখশাশ'-এর কথা বলা হয়েছে? নাকি এটি হাদীস বুঝার ভুল? আবার একবার মুসলিম শরীফে পড়ুন ঃ-

وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ منْ قَوْمه فَاجْتَوَوْا الْمَدينَةَ فَمَرضَ فَجَزعَ فَأَخَذَ مَشَاقصَ لَهُ فَقَطَعَ بهَا بَرَاجمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرو في مَنَامه فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْه فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لي بهجْرَتي إلَى نَبيِّه ﷺ فَقَالَ مَا لي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قيلَ لي لَنْ نُصْلحَ منْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُول اللَّه ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: اللَّهُمَّ وَليَدَيْه فَاغْفرْ.

দাওস গোত্রের তুফাইল বিন আমর হিজরত করলে তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর সাথে হিজরত করে। মদীনার আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ার ফলে সে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে অধৈর্য হয়ে তীরের ফলা দিয়ে নিজের হাতের আঙ্গুলের জোড় কেটে ফেলে। এর ফলে তার দুটি হাত হতে সজোরে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং পরিশেষে সে মারা যায়। তুফাইল বিন আম্র তাকে স্বপ্নে দেখেন, তার আকার-আকৃতি সুন্দর। কিন্তু দেখলেন, সে তার হাত দুটিকে ঢেকে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কি আচরণ করেছেন? সে বলল, নবী ﷺ-এর দিকে হিজরত করার কারণে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার হাত দুটি ঢাকা কেন? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে, তুমি নিজে যা নষ্ট করেছ, তা কখনই ঠিক করব না। তুফাইল আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এ ঘটনা খুলে বললে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে আল্লাহ! আর তার হাত দুটিকেও ক্ষমা করে দাও।" (মুসলিম ১৬৭নং)

এখন বুঝতেই পারছেন, নকলের ধকল কত বড়! নকল বড় সহজ, কঠিন হল তাহক্বীক। আর তার জন্য বর্তমান বিশ্বের মুহাদ্দিসীনদের বই-পুস্তক পড়তে হয়।

৪। মা আয়েশার হাদীস, আমি নাবী কারীম ﷺ-এর দুটি হাত তোলা অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেলাম, তিনি হযরত উসমানের (রা) জন্য দোয়া করছেন।

(ক) এতে নামায বাদের কথা নেই।

(খ) এতে জামাআতী দুআও নেই।

৫। মুসলীম শরীফে, আব্দুর রহমান ইবনে সামোরার হাদিসে কোসুফ নামাযের বিবরণে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নাবী করিমের নিকটস্থ হলাম, তিনি তখন দুটি হাত তুলে দোয়া করছেন।

এবারে মুসলিম শরীফে পড়ুন ঃ-

عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن سَمُرَةَ وَكَانَ منْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ

كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

(ক) সামুরাহ ও আয়েশার হাদীস এক নয়।

(খ) এখানে নামাযের ভিতরে দুআর কথা আছে; নামাযের পরে নয়। তাছাড়া নামাযটিও ফরয নয়। পরন্তু নামাযের ভিতরে হাত তুলে দুআ কুনূতে কোন সমস্যা নেই। যেমন পূর্বেই জেনেছেন।

৬। এবার মা আয়েশার কুসূফের হাদীস পড়ুন ঃ-

ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

অর্থাৎ তিনি খুতবা দিলেন এবং তাতে বললেন, নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। বর্ণনায় অতিরিক্তভাবে আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর হাত দুটি তুলে বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?"

(ক) এ হাদীসে নামাযের পর হাত তোলার কথা নেই।

(খ) এতে খুতবার পর হাত তোলার কথা বলা হয়েছে।

(গ) এতে দুআ করার কথাই নেই। এতে হাত তুলে তবলীগের উপর সাক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে।

সুতরাং এ হাদীস ফরয নামাযের পর হাত তুলে ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী দুআর প্রমাণের জন্য পেশ করা কি যুক্তিযুক্ত?

৭। মা আয়েশার আরেকটি হাদিসে বাকী' অধিবাসীদের জন্য তাঁর দুআয় হাত তুললেন। তাঁর দুটি হাত তুললেন তিন বার। (মুসলিম)

এ হাদীসে কবর যিয়ারত করতে গিয়ে হাত তুলে দুআর কথা বলা হয়েছে। কবর যিয়ারতে কবর বাসীর জন্য একাকী হাত তুলে দুআ সুন্নত। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দিয়ে ফরয নামাযের পর হাত তুলে ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী দুআ প্রমাণ করা যায় না।

৮। আবূ হুরাইরার সুবৃহৎ হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ-

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ.

অতঃপর তিনি যখন তাওয়াফ থেকে ফারেগ হলেন, তখন স্বাফা পাহাড়ে চড়ে কা'বার দিকে তাকিয়ে নিজের হাত দুটিকে তুললেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করতে ও ইচ্ছামত দুআ করতে লাগলেন। (মুসলিম)

এ হাদীসেও দাবী প্রমাণ হয় না। পক্ষান্তরে যা প্রমাণ হয় তা সাঈ করতে গিয়ে স্বাফা পাহাড়ে চড়ে একাকী হাত তুলে দুআ। আর তাতে কারো দ্বিমত নেই।

৯। বুখারী মুসলীমে, ইবনুত তুবাইয়্যার (?!) বিবরনে আবূ হোমায়েদের হাদিসে, তিনি (সঃ) এমনভাবে হাত তুললেন, বর্ণনাকারী বলছেন, আমি তাঁর (সঃ) বগলের ধূসররং (অন্য হাদিসে সফেদী) দেখতে পেলাম। তিনি (সঃ) বলছিলেন, হে আল্লা (তাবলিগ করতে পারলাম? আমি কি প্রচার করতে পেরেছি?) আমি কি পৌছাতে পারলাম?

হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ-

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ:.... ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ.

এ হাদীসে ইবনুল লুতবিয়্যাহর ভুলের জন্য খুতবা দিলেন। অতঃপর দুই হাত তুলে আল্লাহকে তবলীগের উপর সাক্ষী রাখলেন। এখানে দুআ বা জামাআতী দুআর কথা নেই।

১০। আব্দুল্লা ইবনে উমার নয়, আব্দুল্লা ইবনে আমর হতে বর্ণিত, নবী ﷺ ইব্রাহীম ﷺ ও ঈসা ﷺ সম্পর্কিত দুটি আয়াত তেলাঅত করে হাত দুটিকে তুলে বললেন, “হে আল্লাহ! আমার উম্মত?”

এখানেও নামায বাদে দুআ নয়। আর জামাআতী দুআও নয়।

১১। হযরত উমার ফারুক ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর কেবলা মুখে হাত তুলে দুআ করলেন।

প্রথমতঃ হাদীসটি সহীহ নয়। (দেখুন সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১২৪২নং)

দ্বিতীয়তঃ এটি নামাযের পরও নয় এবং জামাআতী দুআও নয়।

১২। উসামা ﷺ-এর হাদীস, আরাফার ময়দানে নবী ﷺ হাত তুলে দুআ করেছেন।

এ দুআর ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। আরাফাতের ময়দানে হাজীগণ হাত তুলে একাকী দুআ করে থাকেন। আর তা নামাযের পরও নয় এবং জামাআতী দুআও নয়।

১৩। আবূ দাউদে **সুন্দর সনদের আলে সা’দের জন্য হাত তুলে দুআ** করার হাদীস।

প্রথমতঃ এ হাদীস সহীহ নয়। (দেখুন ঃ যয়ীফ আবূ দাউদ) দ্বিতীয়তঃ তা নামাযের পর নয় এবং জামাআতীও নয়। বরং সা’দ ﷺ-এর ভক্তি ও খিদমত প্রদর্শনের বিনিময় স্বরূপ দুআ।

১৪। **‘জুমার দিন একজন আরব্য পল্লীবাসী আল্লার রসূলের নিকট এসে বললো, চতুষ্পদ প্রাণী হালাক (মরে গেলো) হয়ে গেলো, বাল বাচ্চা, সন্তান সন্ততি হালাক হয়ে গেল, এবং সমস্ত লোকেরা হালাক হয়ে গেলো। (লোকটি তাঁকে বলে নাই যে, হে আল্লাহর রাসূল ঐ অসুবিধার জন্য দুআ করুন। এর প্রমাণ হাদিসে নাই। কথাটা অলক্ষ্যে আন্দাজে বলা হয়েছে।) তা আল্লার রাসুল (সঃ) তাঁর দুটি হাত তুললেন এবং (ঐরূপ দোয়া) করলেন (হাদিসটি আম, খুতবায় হাত তুলে দোয়া নাই, অতএব ফরয নামায শেষে যা মামুল সালাম ফিরে ইনহিরাফ করে)। অতঃপর (সমাগত মুসাল্লী সাহাবী (রাঃ) লোকেরা তাদের সকলের হাত তুলে রাসুল (সঃ) কারিমের সঙ্গে সবাই দোয়া করেন।’**

(ক) এখানে যে কয়টি দাবী করা হয়েছে তা একজন বড় মুহাদ্দিস ছাড়া কোন ‘মুহদিস’ করতে পারেন না। হাদীসের সমস্ত গ্রন্থ মন্থন ও সমস্ত রেওয়ায়াত একত্র দর্শন না করে এমন দাবী করাই যায় না।

(খ) (লোকটি তাঁকে বলে নাই যে, হে আল্লাহর রাসূল ঐ অসুবিধার জন্য দুআ করুন। এর প্রমাণ হাদিসে নাই।) এ দাবী মিথ্যা।

(গ) (হাদিসটি আম, খুতবায় হাত তুলে দোয়া নাই, অতএব ফরয নামায শেষে যা মামুল সালাম ফিরে ইনহিরাফ করে)। এটাও আন্দাজে মিথ্যা দাবী। অথচ হাদীসে ফরয নামাযের পরের কথাও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মামুলের নাম নিয়ে আমূল ভিত্তিহীন দাবী অভিমতদাতা বড় বড় ডিগ্রিধারী হুজুররাও মেনে নিয়েছেন!

আসলে লাল রঙের চশমা পরে দৃষ্টিপাত করলে গোটা দুনিয়া লালই দেখায়!

এবারে আসুন দেখি দুনিয়া সত্যই লাল কি না? বেশী দূর নয়, বুখারী-মুসলিমেই আনাস ﷺ-এর অন্য বর্ণনায় এর বিবরণ পাবেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَة مِنْ بَاب كَانَ نَحْوَ دَار الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَائمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدَيْه ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا .... ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ

يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدَيْه ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا .....

একদা মহানবী ﷺ জুমআর দিন দাঁড়িয়ে জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এক মরুবাসী (বেদুঈন) উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেল আর পরিবার পরিজন (খাদ্যের অভাবে) ক্ষুধার্ত থেকে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' তখন নবী ﷺ নিজের দুই হাত তুলে দুআ করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে দুআর জন্য হাত তুলল। ফলে এমন বৃষ্টি শুরু হল যে পরবর্তী জুমআতে উক্ত (বা অন্য এক) ব্যক্তি পুনরায় খাড়া হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ঘর-বাড়ি ভেঙে গেল এবং মাল-ধন ডুবে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দুআ করুন!' মহানবী ﷺ তখন নিজের হাত তুলে পুনরায় বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দুআ করলেন এবং বৃষ্টিও থেমে গেল। *(বুখারী ৯৩২, ৯৩৩, ১০১৩, ১০২৯, মুসলিম ৮৯৭নং, নাসাঈ, আহমাদ ৩/২৫৬, ২৭১)*

(ঘ) এটি ইস্তিস্কার নামায নয়, বরং ইস্তিস্কার দুআর জন্য জামাআতবদ্ধভাবে হাত তোলা। এ দুআ সুন্নত হওয়ার ব্যাপারেও কোন দ্বিমত নেই। আর এই হাদীস দিয়ে আম দুআতে হাত তোলার ব্যাপারেও কোন সমস্যা নেই। এই জন্যই ইমাম বুখারী **'তাঁর আলাদা পুস্তক কিতাবুদ দাওয়াতে'** নয় বরং বুখারী শরীফেই 'কিতাবুদ দাওয়াত'এ আনাসের ঐ হাদীস দ্বারা আম দুআয় হাত তোলা বৈধ বলে প্রমাণ করেছেন।

সমস্যা হল এই হাদীস দিয়ে খাস দুআ ফরয নামাযের পর জামাআতী দুআ প্রমাণ করায়। একবার ভেবে দেখুন - যেমনটি পূর্বেই জেনেছেন - যদি ফরয নামাযের পর প্রচলিত মুনাজাত 'মামুল' হত, তাহলে কি ঐ বেদুঈন খুতবা চলাকালে দুআর আবেদন জানাতেন? এবং আল্লাহর নবী ﷺ খুতবাতেই হাত তুলে দুআ করতেন?

যে ইমাম বুখারী 'কিতাবুদ দাওয়াত'এ আম দুআর জন্য হাত তোলার ব্যাপারে বাব বেঁধেছেন, সেই ইমাম বুখারী ঐ অধ্যায়েই বাব বেঁধে বলেছেন, 'বাবুদ দুআই বা'দাস স্বালাহ' (নামাযের পর দুআ)। তারপর যে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে দুআয়ে মাসআলাহ (প্রার্থনামূলক দুআ)র কথা নেই; বরং তাতে দুআয়ে যিকরের কথা আছে। সেখানে কিন্তু তিনি ঐ শ্রেণীর হাদীস এনে নামাযের পর হাত তুলে দুআ প্রমাণ করতে চাননি। কারণ তিনি একজন মুহাদ্দিস।

১৫। উনারা বলেন, **'আল্লাহর বাণীঃ- যখন তুমি নামায হতে ফারিগ হবে, তখন তুমি দুআতে মেহনত ও মশগুল এবং তোমার প্রভুর প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারে নম্র হয়ে চাইবে। সূরা ইনশিরাহ, তফসীরে জালালাইন।'**

এইভাবে আল্লাহর নামে এতগুলি কথা চালিয়ে দিলে কি আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ হয় না? আল্লাহ কি বলেছেন 'নামায হতে ফারিগ' হওয়ার কথা? তফসীরকেও আল্লাহর বাণীর মধ্যে শামিল করলে সাধারণ মানুষ কি বুঝবে? তফসীর জালালাইনেও কি 'এবং তোমার প্রভুর প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারে নম্র হয়ে চাইবে।' এ কথা আছে?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا فَرَغْتَ فانصب }

অতএব যখনই তুমি অবসর পাও, তখনই সচেষ্ট হও।

এর তফসীর বিভিন্ন করা হয়েছে; যেমন, নামায থেকে ফারেগ হলে দুআর জন্য সচেষ্ট হও।

তাশাহহুদ থেকে ফারেগ হলে দুআর জন্য সচেষ্ট হও।

তাবলীগ থেকে ফারেগ হলে দুআর জন্য সচেষ্ট হও।

জিহাদ থেকে ফারেগ হলে দুআর জন্য সচেষ্ট হও।

দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে ফারেগ হলে ইবাদতের জন্য সচেষ্ট হও।

এতগুলো তফসীর থাকতে ঐ তফসীর যেহেতু মতের সমর্থন যোগায় সেহেতু গৃহীত হয়েছে এবং মিলিয়ে-জুলিয়ে আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও তাতে হাত তুলে দুআ বা জামাআতী দুআর কথা নেই। অনুরূপ তা থেকে উদ্দেশ্য দুআয়ে যিক্‌রও হতে পারে, যেমন ইমাম বুখারীর বাবে তা স্পষ্ট।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় তফসীর গ্রহণ করলে মহানবী ﷺ-এর নির্দেশের অনুসারী হয়। আর যেটাকে 'দুবুরুস স্বালাত' বলা হয়, যেখানে আল্লাহর নবী দুআ করেছেন, করতে বলেছেন এবং ঐ সময়ে দুআ কবুল হয় বলেছেন।

১৬। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, দুআ অপেক্ষা সম্মানিত কোন বিষয় নেই। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

"যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।" *(তিরমিযী ৫/৪৫৬, ইবনে মাযাহ ২/১২৫৮)*

এটি সাধারণ দুআর ফযীলত। এতে হাত তুলে বা জামাআত করে বা নামাযের পরে কোন কথাই নেই।

১৭। নবী (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যখন আল্লাহর নিকট কিছু চাইবে, তখন তোমাদের হাতের দিক সামনে রাখবে ----। যখন দুআ শেষ করবে, তখন তোমাদের হাত মুখে ফিরাবে।' আবূ দাউদ

(ক) দুআ শেষে মুখে হাত বুলানোর কোন হাদীস সহীহ নয়। (দেখুন ঃ যয়ীফুল জামে ৩২৭৪, ৪৪১২নং)

(খ) এতে ফরয নামাযের পর বা জামাআতের কথা নেই। সুতরাং এ হাদীসও দাবীর সপক্ষে দলীলযোগ্য নয়।

১৮। **'আল-আযরাক বিন কায়েশ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন নাবী (সাঃ) নামাযের সালাম ফিরেছেন, ঐ মূহুর্তে একজন সাহাবী দাঁড়িয়েছেন তৎক্ষণাৎ হযরত উমার (রাঃ) ঐ ব্যক্তির ঘাড় ধরে ঝাঁকানী দিয়ে বলেন, বসো! এই জন্যে আহলে কেতাবকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করেছিলেন। কারণ তারা নামাযের পর যিকির ও দুআতে সময় দিতেন না। তখন নাবী (সাঃ) তাঁর দিকে দেখে বলেন - হে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)! তোমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা হক কথাই বলিয়েছেন। (আবূ দাউদ)'**

এবার হাদীসের মতন পড়ুন ঃ-

عَنْ الْأَزْرَق بْن قَيْس قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ فَقَالَ صَلَّيْتُ هَذه الصَّلَاةَ أَوْ مثْلَ هَذه الصَّلَاة مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَان في الصَّفِّ الْمُقَدَّم عَنْ يَمينه وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبيرَةَ الْأُولَى منْ الصَّلَاة فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمينه وَعَنْ يَسَاره حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْه ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفتَال أَبي رِمْثَةَ يَعْني نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبيرَةَ الْأُولَى منْ الصَّلَاة يَشْفَعُ فَوَثَبَ إِلَيْه عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكبه فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلسْ فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلكْ أَهْلَ الْكتَاب إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب.

উক্ত সংক্ষেপ অনুযায়ী সঠিক অনুবাদ ঃ আল-আযরাক বিন কাইস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, একদিন নবী ﷺ নামাযের সালাম ফিরেছেন, ঐ মুহূর্তে একজন সাহাবী সাথে সাথে সুন্নত পড়ার জন্য দাঁড়িয়েছেন। তৎক্ষণাৎ হযরত উমার (রাঃ) ঐ ব্যক্তির ঘাড় ধরে ঝাঁকানী দিয়ে বলেন, বসো! এই জন্যে আহলে কেতাবকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করেছিলেন, কারণ তাদের নামাযসমূহের মধ্যে ব্যবধান থাকত না। তখন নাবী (সাঃ) তাঁর দিকে দেখে বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা হক কথাই বলিয়েছেন। (আবূ দাউদ)

(ক) এ হাদীসটি সহীহ নয়; বরং যয়ীফ। (দেখুন ঃ যয়ীফ আবূ দাঊদ)

(খ) উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হাদীসটির অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। উমার ﷺ-এর ঝাঁকানী ও আহলে কিতাবের ধ্বংসের উল্লেখিত কারণ অনুবাদে গোপন করে, মুনাজাত প্রমাণ করার জন্য **'তারা নামাযের পর যিকির ও দুআতে সময় দিতেন না।'** উল্লেখ করা হয়েছে।

(গ) আসলে এ হাদীসটি ঐ হাদীসের অনুরূপ যা পুস্তিকার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সায়েব বিন য়্যাযীদ বলেন, একদা আমি মুআবিয়া ﷺ এর সাথে (মসজিদের) আমীর-কক্ষে জুমআর নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরলে আমি উঠে সেই জায়গাতেই সুন্নত পড়ে নিলাম। অতঃপর তিনি (বাসায়) প্রবেশ করলে একজনের মারফৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তুমি যা করলে তা আর দ্বিতীয়বার করো না। জুমআর নামায সমাপ্ত করলে কথা বলা অথবা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে আর অন্য কোন নামায মিলিয়ে পড়ো না। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, (মাঝে) কথা না বলে বা বের হয়ে না গেয়ে কোন নামাযকে যেন অন্য নামাযের সাথে মিলিয়ে না পড়ি।' *(মুসলিম ৮৮৩, আবু দাউদ ১১২৯নং, মুসনাদে আহমদ ৪/৯৫, ৯৯)*

(ঘ) এতে যিক্‌র ও দুআ অনুমান করে প্রমাণ হতে পারে; তবে হাত তুলে বা জামাআত করে নয়। পরন্তু উদ্দেশ্য ছিল, ফরয নামাযের সাথে মিলিয়ে সুন্নত না পড়া। ইমাম আবূ দাঊদ এই হাদীসটি যে পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন, তার শিরনামা দিয়েছেন, 'সেই ব্যক্তি প্রসঙ্গে যে সেই জায়গাতেই সুন্নত পড়ে, যে জায়গাতে ফরয পড়েছে।'

১৯। নবী ﷺ বলেন, সব থেকে বড় অকর্মা ও অক্ষম সেই ব্যক্তি, যে নিজের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ প্রার্থনা করে না।---' তাবরানী।

এ হাদীস পেশ করার অর্থ কি এই যে, যারা ফরয নামাযের পর মুনাজাত করে না, তারা আসলে দুআই করে না? যদি এ রকম কেউ বুঝে থাকেন, তাহলে 'রাম উল্টা বুঝিলে' বলার কি আছে? আল্লাহর কসম! এই জামাআতী দুআ, সমস্বরে জামাআতী দরূদ এবং সমস্বরে জামাআতী ঈদের তকবীর এত ভালো লেগেছে যে, তা পরম আবেগ ও চরম উদ্দীপনার সাথে করেছি এবং আজও তা ভালো লাগে। কিন্তু তা শরীয়ত-সম্মত নয় জানার পর থেকে মহব্বত থাকতেও বর্জন করেছি। যেহেতু শরীয়তের আমল কেবল ভালো মনে করে মহব্বত ও আবেগবশে পালন করলেই হয় না, আসলে তা তরীকায়ে মুহাম্মাদী কি না -তা দেখতে হবে। যেহেতু তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম)

ফাযায়েলে আ'মালে যয়ীফ হাদীসের ব্যবহার

উনারা বলবেন, **আমরা যে হাদীসই পেশ করি, সেটাই যয়ীফ?**

আসলেই তা যয়ীফ। আপনারা সেটাকে দলীল মনে করলেও যয়ীফ, আর না করলেও যয়ীফ। আর যদি মনে করেন যে, আপনারা দলীলরূপে পেশ করার পর জোর করে তাকে যয়ীফ বানানো হয়, তাহলে এ রকম মনে করা গা-জোরামি হবে। ফরয নামাযের পরে হাত তুলে মুনাজাতের সাথে অথবা যারা তা কর্তব্য মনে ক'রে করে থাকে তাদের সাথে কি আমাদের কোন দুশমনি আছে? নাকি তার বিপরীতে আমাদের কোন স্বার্থ আছে?

বাকী থাকল **'ফাযায়েলে আমালিয়াতে, হাদিস, যা মৌযু নয়, যায়িফ দ্বারা, পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়।'** এ কথা প্রসিদ্ধ হলেও তার ব্যাখ্যা জানা দরকার। এ ব্যাপারে সেই প্রবন্ধই তুলে ধরি, যা আমি 'বিদআত দর্পণ' পুস্তিকায় লিখেছি ঃ-

'ফাযায়েলে আ'মালে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল চলবে' - এ কথা শর্তহীন নয়। *(দেখুন ঃ তানবীহু উলিল আবসার)*

"মুহাদ্দেসীন ও অসূলিইয়্যীনদের নিকট যথাস্থানে নির্দিষ্ট শর্তাবলীর সাথে ফাযায়েলে আ'মালে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা যায়।" এই কথার উপর দুটি আপত্তিমূলক টিপ্পনী রয়েছে।

(১) এই উক্তি হতে অনেকেই 'সাধারণ' বা 'ব্যাপক' অর্থ বুঝে থাকে। মনে করে যে, উক্ত আমলে উলামাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। অথচ এ রকমটা নয় বরং তাতে বিদিত মতভেদ বর্তমান যা বিভিন্ন হাদীসের পারিভাষিক (অসূলেহাদীসের) গ্রন্থসমূহে বিশদভাবে আলোচিত। যেমন আল্লামা শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী (রঃ) তার গ্রন্থ (কাওয়ায়েদুল হাদীসে) আলোচনা করেছেন।

তিনি ১১৩ পৃষ্ঠায় ইমামগণের এক জামাআত থেকে নকল করেন যে, তাঁরা আদপে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা ঠিক মনে করতেন না। যেমন, ইবনে মাঈন, বুখারী, মুসলিম, আবু বাকর ইবনুল আরাবী প্রভৃতিগণ। এঁদের মধ্যে ইবনে হায্‌ম অন্যতম; তিনি তার গ্রন্থ 'আল-মিলাল অন্-নিহাল' এ বলেন, '(সেই হাদীস দ্বারা আমল সিদ্ধ হবে) যে হাদীসকে পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেরা (অর্থাৎ, বহু সংখ্যক লোক) কিংবা সকলেই সকল হতে কিংবা বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত হতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু যে হাদীসের বর্ণনা-সূত্রে কোন মিথ্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিংবা কোন অমনোযোগী গাফেল ব্যক্তি কিংবা কোন পরিচয়হীন অজ্ঞাত ব্যক্তি থাকে, তাহলে সেই হাদীস (যয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও তার) দ্বারা কতক মুসলিম বলে থাকে (আমল করে থাকে)। অবশ্য আমাদের নিকট এমন হাদীস দ্বারা কিছু বলা (বা আমল করা), তা সত্য জানা এবং তার কিছু অংশ গ্রহণ করাও বৈধ নয়।'

হাফেয ইবনে রজব তিরমিযীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে (২/১১২)তে বলেন, 'ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় যা উল্লেখ করেছেন তার প্রকাশ্য অর্থ এই বুঝায় যে, তরগীব ও তরহীবে (অনুপ্রেরণাদায়ক ও ভীতি সঞ্চারক)এর হাদীসও তার নিকট হতেই বর্ণনা করা হবে, যার নিকট হতে আহকাম (কর্মাকর্ম সম্পর্কিত)এর হাদীস বর্ণনা করা হয়। (অর্থাৎ যয়ীফ রাবী হতে যেমন আহকামের হাদীস বর্ণনা করা হয় না, তেমনিই সেই রাবী হতে তরগীব ও তরহীবের হাদীসও বর্ণনা করা হবে না।)

এ যুগের অদ্বিতীয় মুহাদ্দেস আল্লামা আলবানী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, 'এই অভিমত ও বিশ্বাস রেখেই আমি আল্লাহর আনুগত্য করি এবং এই অভিমতের প্রতিই মানুষকে আহবান করি যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আদপে আমল করা যাবে না, না ফাযায়েল ও মুস্তাহাব আমলে আর না অন্য কিছুতে। কারণ, যয়ীফ হাদীস কোন বিষয়ে অনিশ্চিত ধারণা জন্মায় মাত্র (যা নিশ্চিতরূপে রসূল ﷺ-এর বাণী নাও হতে পারে।) [১] এবং আমার জানা মতে, উলামাদের নিকট এটা অবিসংবাদিত। অতএব যদি তাই হয়, তবে কিরূপে ঐ হাদীস দ্বারা আমল করার কথা বৈধ বলা যায়? অথচ আল্লাহ অজাল্লা তাঁর কিতাবে একাধিক স্থানে 'ধারণার' নিন্দাবাদ করেছেন; তিনি বলেন,

﴿ وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, ওদের এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই, ওরা অনুমানের অনুসরণ করে অথচ সত্যের বিরুদ্ধে অনুমানের (ধারণার) কোন মূল্য নেই। *(সূরা নাজ্‌ম ২৮ আয়াত)*

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা অনুমান (ধারণা) করা হতে বাঁচ। অবশ্যই অনুমান

---

(১) অনেকে বলে থাকে যে, 'কসম করে বলতে পারবে যে, যয়ীফ হাদীস রসূলের উক্তি নয়! উত্তরে বলা যায় যে, তা বলা যাবে না ঠিক। কিন্তু কসম করে এও বলতে পারা যাবে না যে, 'যয়ীফ হাদীস তাঁর উক্তি।' সুতরাং সন্দিহান বিদ্যমান, যা ত্যাগ করাই উত্তম এবং পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম।

সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

জেনে রাখুন যে, আমি যে রায় এখতিয়ার করেছি তার প্রতিপক্ষের নিকট এই রায়ের বিপক্ষে) কিতাব ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই। অবশ্য পরবর্তীযুগের কোন আলেম তার গ্রন্থ 'আল-আজবিবাতুল ফায়েলাহ' তে এই মাসআলার উপর নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে (৩৬-৫৯পৃঃ) ওঁদের সমর্থনে (ও আমাদের এই অভিমতের বিরুদ্ধে) দলীল পেশ করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সপক্ষে অন্ততঃপক্ষে একটিও এমন দলীল উল্লেখ করতে সক্ষম হননি, যা হুজ্জতের উপযুক্ত! হ্যাঁ, তবে কিছু এমন উক্তি তাঁদের কারো কারো নিকট হতে নকল করেছেন, যেগুলি উক্ত বিতর্ক ও সমীক্ষার বাজারে অচল। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐ সমস্ত উক্তির কিছু কিছুতে পরস্পর-বিরোধিতাও বিদ্যমান। যেমন, ৪১ পৃষ্ঠায় ইবনুল হুমাম হতে নকল করেন, "গড়া নয় এমন যয়ীফ হাদীস দ্বারা ইস্তিহবাব প্রমাণিত হবে।" অতঃপর ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় জালালুদ্দীন দাওয়ানী হতে নকল করেন, তিনি বলেছেন, এ কথা সর্বসম্মত যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা শরীয়তের 'আহকামে খামসাহ' (অর্থাৎ ওয়াজেব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মকরূহ ও হারাম) প্রমাণিত হবে না এবং ওর মধ্যে ইস্তিহবাবও।

আমি (আলবানী) বলি, এ কথাটাই সঠিক! যেহেতু অনুমান দ্বারা আমল নিষিদ্ধ এবং যয়ীফ হাদীস অনিশ্চিত অনুমান বা ধারণা সৃষ্টি করে, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।'

মোট কথা, ফাযায়েলে আ'মাল বলতে এমন আমল যার ফযীলত আছে, তা যয়ীফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে করা যাবে না। করলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। যেহেতু যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন আহকাম বা আমল (অনুরূপ কোন আকীদাও) সাব্যস্ত হয় না। তবে এমন আমল যা সহীহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তার ফযীলত বর্ণনায় আমল করা যায়, তবে তারও শর্ত আছে যা পরে বলা হবে।

উদাহরণস্বরূপ, চাশ্তের নামায সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। *(মুসলিম)* কিন্তু তার ফযীলত প্রসঙ্গে এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি ঐ নামায পড়বে তার পাপ সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি নিয়মিত বারো রাকআত চাশ্তের নামায পড়ে, তার জন্য আল্লাহ পাক বেহেশ্তে এক সোনার মহল তৈরী করেন।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

আর এ দুটি হাদীসই যয়ীফ। চাশ্তের নামাযের এই ফযীলত বিশ্বাসে (ওঁদের মতে) তা ব্যবহার করা যায়।

অনুরূপভাবে কুরবানী করা ও তার মর্যাদা কুরআন ও সুন্নাহতে প্রমাণিত। তার ফযীলত বর্ণনায় (ওঁদের মতে কিছু শর্তের সাথে) "কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে এক একটা নেকী--।" এই হাদীস ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, 'শরীয়তে যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করা বৈধ নয়, যা সহীহ বা হাসান নয়। কিন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রভৃতি উলামাগণ ফাযায়েলে আ'মালে সাবেত (প্রমাণসিদ্ধ) বলে জানা না যায় এমন হাদীস বর্ণনা করাকে জায়েয বলেছেন, যদি তা (ঐ যয়ীফ হাদীস) মিথ্যা বলে জানা না যায় তবে।

অর্থাৎ, যখন জানা যাবে যে, আমল শরয়ী (সহীহ) দলীল দ্বারা বিধেয় এবং তার ফযীলতে এমন হাদীস বর্ণিত হয় যা মিথ্যা (মওযু') বলে জানা যায় না, তাহলে (হাদীসে বর্ণিত) সওয়াব সত্য হতে পারে (এই বিশ্বাস করা যায়)। কিন্তু ইমামগণের কেউই এ কথা বলেননি যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন কিছুকে ওয়াজেব অথবা মুস্তাহাব করা যাবে। আর যে এ কথা বলে সে ইজমা' (সর্ববাদীসম্মতি)র বিরোধিতা করে। তদনুরূপ, কোন শরয়ী (সহীহ) দলীল ছাড়া কোন কিছুকে হারাম করাও অবৈধ। কিন্তু যদি (কোন সহীহ হাদীস দ্বারা) তার হারাম হওয়ার কথা বিদিত হয়

এবং ঐ কাজের কর্তার জন্য শাস্তি বা তিরস্কারের কথা কোন এমন (দুর্বল) হাদীসে বর্ণিত হয় - যা মিথ্যা বলে জানা না যায় - তবে তা (ঐ শাস্তির বিশ্বাসে) বর্ণনা করা বৈধ।

অনুরূপভাবে তরগীব ও তরহীবে ঐরূপ হাদীস বর্ণনা করা বৈধ হবে; যদি তা মিথ্যা (গড়া) বলে পরিচিত না হয়। কিন্তু এ কথা জানা জরুরী হবে যে, আল্লাহ এ বিষয়ে এই অজ্ঞাত-পরিচয় হাদীস ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় (সহীহ) দলীলে তরগীব বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইসরাঈলিয়াতও তরগীব ও তরহীবে বর্ণনা করা যায়; যদি তা মিথ্যা বলে বিদিত না হয় এবং যখন জানা যায় যে, ঐ বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাদের শরীয়তে আদেশ দান করেছেন অথবা নিষেধ করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র অপ্রমাণিত (অশুদ্ধ) ইসরাঈলিয়াত দ্বারা আমাদের শরীয়ত প্রমাণ করা হবে -এ কথা কোন আলেম বলেন না। বরং ইমামগণ এই ধরণের কোন হাদীসকেই শরীয়তের বুনিয়াদ করেন না। আহমাদ বিন হাম্বল এবং তার মত কোন ইমামই শরীয়তে ঐ ধরনের হাদীসের উপর নির্ভর (ভিত্তি) করতেন না। যে ব্যক্তি নকল করে যে, আহমাদ যয়ীফ হাদীসকে হুজ্জত (বা দলীল) করতেন; যে হাদীস সহীহ বা হাসান নয়, তবে নিশ্চয় সে তাঁর সম্পর্কে ভুল বলে।' *(আল কায়েদাতুল জালীয়াহ ৮২ পৃঃ, মজমুআ ফাতাওয়া ১/২৫১ নং)*

আল্লামা আহমাদ শাকের 'আল-বায়েযুল হাযীষ' গ্রন্থে (১০১ পৃষ্ঠায়) বলেন, 'আহমাদ বিন হাম্বল, আব্দুর রাহমান বিন মাহদী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রঃ) এর উক্তি, 'যখন আমরা হালাল ও হারামে (আহকামে) হাদীস বর্ণনা করি, তখন কড়াকড়ি করি এবং যখন ফাযায়েল ইত্যাদিতে বর্ণনা করি তখন শৈথিল্য করি--।'

আমার মতে -অল্লাহ আ'লাম- তাঁদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, শৈথিল্য কেবল হাসান হাদীস গ্রহণে করতেন যা 'সহীহ' এর দর্জায় পৌঁছে না। কারণ সহীহ ও হাসানের মাঝে পার্থক্যরূপ পরিভাষা তাঁদের যুগে স্পষ্ট স্থিত ছিল না। বরং অধিকাংশ পূর্ববর্তীগণ হাদীসকে কেবল সহীহ অথবা যয়ীফ (এই দুই প্রকার) বলেই মনে করতেন।

সুতরাং তাঁদের ঐ শৈথিল্য যয়ীফ হাদীস বর্ণনায় নয়, হাসান হাদীস বর্ণনায়।)

আল্লামা আলবানী বলেন, 'আমার নিকট এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা রয়েছে, তাদের ঐ উল্লেখিত শৈথিল্য ইসনাদ (বর্ণনা সূত্র)সহ যয়ীফ হাদীস রেওয়ায়াত করার উপর মানা যায় - যেমন তাদের বর্ণনার ধারা ও প্রকৃতি; যে ইসনাদ সমূহের মাধ্যমে হাদীসের দুর্বলতা জানা সম্ভব হয়। সুতরাং কেবলমাত্র সনদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হয় এবং 'যয়ীফ' বলে বিবৃত করার প্রয়োজন আর থাকে না। কিন্তু ঐ ধরণের হাদীস বিনা সনদে বর্ণনা করা -যেমন পরবর্তীকালে উলামাগণের ধারা ও প্রকৃতি এবং তার দুর্বলতা বর্ণনা না করা -যেমন ওঁদের অধিকাংশের রীতি - এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে তাঁরা (ইমাম আহমাদ প্রভৃতিগণ) বহু ঊর্ধ্বে এবং এ বিষয়ে তাঁরা আল্লাহকে অধিক ভয় করতেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন।'

(২) যে ব্যক্তি এ ধরণের কোন গ্রন্থ লিখেন যাতে চোখ বুজে সহীহ-যয়ীফ সবই সংকলন করেন এবং মনে করেন যে, কিছু শর্তের সাথে যয়ীফ হাদীস দ্বারা ফাযায়েলে আ'মালে আমল করা যায় তাঁর উচিত, গ্রন্থের ভূমিকায় সে বিষয়ে (সাধারণকে) সতর্ক করা এবং ঐ শর্তাবলী উল্লেখ করে (সেই অনুযায়ী) আমল করতে সাবধান করা। যাতে পাঠকও অজান্তে গ্রন্থে উল্লেখিত প্রত্যেক হাদীসের উপর আমল এবং মুবাল্লেগও ঐ গ্রন্থ শুনিয়ে সকলকে আমল করার তাকীদ না করে বসে। ফলে সকলের অজান্তেই সকলে রসূলের বিরোধিতায় আলিপ্ত না হয়ে পড়ে।

সুতরাং ঐ শর্তগুলিকে জানা একান্ত জরুরী; বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁরা ফাযায়েলে যয়ীফকে ব্যবহার করে থাকেন। যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর জীবিত থাকে।

হাফেয সাখাবী 'আল-ক্বওলুল বাদী' (১৯৫ পৃঃ)তে তার ওস্তাদ হাফেয ইবনে হাজার থেকে ঐ

শর্তগুলি নকল করেছেন এবং তা নিম্নরূপ ঃ-

(ক) হাদীস যেন খুব বেশী যয়ীফ না হয়। অথবা তার বর্ণনা সূত্রে যেন কোন মিথ্যাবাদী, মিথ্যায় কলঙ্কিত বা অভিযুক্ত এবং মারাত্মক ত্রুটি করে এমন ব্যক্তি না থাকে।

(খ) তা যেন (শরীয়তের) 'সাধারণ ভিত্তির' অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ একেবারে ভিত্তিহীন গড়া বা জাল হাদীস না হয়।

(গ) এ হাদীস দ্বারা আমল করার সময় যেন তা প্রমাণিত (বা শুদ্ধ) হাদীস বলে বিশ্বাস না রাখা হয়। যাতে নবী ﷺ-এর সাথে সেই সম্পর্ক না জোড়া হয়; যা তিনি বলেননি।

অতঃপর তিনি বলেন শেযোক্ত শর্ত দুটি ইবনে আব্দুস সালাম ও ইবনে দাক্বীকুল ঈদ হতে বর্ণিত এবং প্রথমোক্তের জন্য আলাঈ বলেন, 'তা সর্ববাদিসম্মত।'

ইবনে হাজার (রঃ) তাঁর পুস্তিকা 'তাবয়ীনুল আজব' এ বলেন, 'আহলে ইল্মগণ ফাযায়েলে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন; যদি তা গড়া না হয় বা খুব বেশী যয়ীফ না হয় - এ কথাটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু এর সাথে এই শর্তও আরোপ করা উচিত যে, আমলকারী যেন ঐ হাদীসটিকে যয়ীফ বলেই বিশ্বাস রাখে (শুদ্ধ মনে না করে) এবং তা যেন প্রচার না করে। যাতে কেউ যেন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করে যা শরীয়ত নয় তাকে শরীয়ত করে না বসে অথবা কোন জাহেল তাকে আমল করতে দেখে তা সহীহ সুন্নাত মনে না করে বসে।

এ বিষয়ে আবু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সালাম প্রভৃতি উলামাগণ বিবৃতি দিয়েছেন। যাতে মানুষ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সেই বাণীর পর্যায়ভুক্ত না হয়ে পড়ে যাতে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন এমন হাদীস বর্ণনা করে যার বিষয়ে সে মনে করে যে তা মিথ্যা, তাহলে সে (বর্ণনাকারী) মিথ্যাবাদীদের একজন।" *(মুসলিম, সহীহুল জামে' ৬১৯৯নং)*

সুতরাং যে আমল করবে তার অবস্থা কি? আহকাম অথবা ফাযায়েলে (যয়ীফ) হাদীস দ্বারা আমল করায় কোন পার্থক্য নেই। (অর্থাৎ যদি যয়ীফ হাদীস দ্বারা আহকাম বা হালাল ও হারামে আমল না চলে তবে ফাযায়েলেও চলবে না।) কারণ, (উভয়ের) সবটাই শরীয়ত।'

আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন, 'এই সমস্ত শর্তাবলী খুবই সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ। যদি যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলকারীরা এর অনুগামী হয়, তাহলে তার ফল এই হবে যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলের সীমা সংকীর্ণ হবে অথবা মূলেই আমল প্রতিহত হবে। এর বিবরণ তিনভাবে দেওয়া যায়ঃ-

প্রথমতঃ প্রথম শর্তটি নির্দেশ করে যে, যে হাদীসকে ভিত্তি করে আমল করার ইচ্ছা হবে সেই হাদীসটির প্রকৃত অবস্থা জানা ওয়াজেব। যাতে বেশী যয়ীফ হলে তার দ্বারা আমল করা থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রত্যেক হাদীসের উপর এই জ্ঞান লাভ জনসাধারণের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। যেহেতু হাদীসশাস্ত্রবিদ উলামার সংখ্যা নেহাতই কম, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। অর্থাৎ, সেই উলামার সংখ্যা নগণ্য যাঁরা তথ্যানুসন্ধানকারী (সমস্ত হাদীসের সত্যাসত্য যাচাইকারী) গবেষণা ও সমীক্ষাকারী হাদীস বিশারদ, যাঁরা রসূল ﷺ হতে শুদ্ধ প্রতিপাদিত হাদীস ব্যতীত লোকদের জন্য অন্য কোন হাদীস পরিবেশন ও বর্ণনা করেন না এবং যয়ীফ (তথা তার নিম্নমানের) হাদীসের উপর সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে থাকেন। বরং এই গ্রুপের উলামা অল্পের চেয়ে কম। সুতরাং আল্লাহই সাহায্যস্থল।

এরই কারণে দেখবেন, যারা হাদীস দ্বারা আমলে আপদগ্রস্ত হয়েছে তারা এই শর্তের স্পষ্ট বিরোধিতা করে। তাদের কেউ যদিও বা সে অহাদীসের আলেম হয় -ফাযায়েলে আ'মালে কোন হাদীস জানা মাত্রই তা অধিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত কিনা তা না জেনেই তার উপর আমল করায় ত্বরান্বিত হয়। এরপর যদি কেউ তাকে ঐ হাদীসের দুর্বলতার উপর সতর্ক করে, তবে শীঘ্র ঐ তথাকথিত 'কায়দার' শরণাপন্ন হয়; "ফাযায়েলে আ'মালে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করা যায়।" পুনশ্চ যখন এই শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে যায়।'

এ বিষয়ে আল্লামা দুটি উদাহরণ পেশ করেন ঃ

(১) "সর্বোৎকৃষ্ট দিন আরাফার দিন; যদি জুমআর দিনের মুতাবেক হয় তবে তা সত্তর হজ্জ অপেক্ষা উত্তম।" *(রাযীন)*

এ হাদীসটির প্রসঙ্গে আল্লামা শায়খ আলী আল-ক্বারী বলেন, 'কিছু মুহাদ্দেসীন বলেন যে, এই হাদীসের ইসনাদটি যয়ীফ, তা সঠিক মানা গেলেও উদ্দেশ্যে কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু যয়ীফ হাদীস ফাযায়েলে আ'মালে গ্রহণীয় এবং আল্লামা আবুল হাসানাত লখনবী এই কথা নকল করে বহাল করেছেন। *(আল আজবিবাতুল ফাযেলাহ ৩৭ পৃঃ)*

কিন্তু ভাবার বিষয় যে, কিরূপে এই শ্রদ্ধাভাজন আলেমদ্বয় উপর্যুক্ত শর্ত লংঘন করেছেন। অথবা নিশ্চয় তাঁরা এই হাদীসের সনদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। থাকলে অবশ্যই তা বিবৃত করতেন এবং তার পরিবর্তে বিতর্ক ছলে 'তা মানা গেলেও' এই কথা বলতেন না। অথচ আল্লামা ইবনুল কাইয়েম ঐ হাদীস প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, 'বাতিল, রসূলুল্লাহ ﷺ হতে ওর কোন ভিত্তি নেই, আর না কোন সাহাবী বা তাবেয়ী হতে।' *(যাদুল মাআদ ১/১৭)*

(২) "যখন তোমরা হাদীস লিখবে, তখন তোমরা তার সনদ সহ লিখ। যদি তা সত্য হয়, তাহলে তোমরা সওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি তা বাতিল হয়, তাহলে তার পাপ তার (বর্ণনাকারীর) হবে।' *(আল আজবিবাতুল ফাযেলাহ ঃ ২৬পৃঃ)*

এই হাদীসটি মওযু' (গড়া হাদীস)। *(দেখুন ঃ সিলসিলাতু আহাদীসিয যয়ীফাহ অল মওযুআহ ৮২২নং)* এতদসত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় লখনবী সাহেব এর উপর চুপ থেকেছেন। কারণ, এটাও ফাযায়েলে আ'মাল তাই! অথচ এটি এমন একটি হাদীস যা যয়ীফ ও জাল হাদীস প্রচার করতে ও তার উপর আমল করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করে। যার মর্মার্থ হচ্ছে নকলকারীর কোন পাপ নেই। অথচ এমন ধারণা আহলে ইল্মদের নীতির পরিপন্থী। যেহেতু তাঁদের নীতি এই যে, গড়ার কথা বিবৃত না করে কোন গড়া হাদীস বর্ণনা করাই জায়েয নয়। তদনুরূপ যথার্থতা যাচাইকারী সংস্কারক উলামা; যেমন ইবনে হিব্বান প্রভৃতিগণের নিকট যয়ীফ হাদীসও (তার দুর্বলতা উল্লেখ না করে বর্ণনা বৈধ নয়)।

আল্লামা আহমাদ শাকের বলেন, উপর্যুক্ত তিনটি শর্তাবলী উল্লেখ করা সর্বাবস্থায় ওয়াজেব। কারণ, তা উল্লেখ না করলে পাঠক অথবা শ্রোতার ধারণা হয় যে, তা সহীহ; বিশেষ করে নকলকারী অথবা বর্ণনাকারী যদি উলামায়ে হাদীসের মধ্যে কেউ হন (অথবা দ্বীনের বুযুর্গ হন ও সমাজে মান্য হন); যাঁর প্রতি সকলে হাদীস বিষয়ে রুজু করে তাহলে। যেহেতু যয়ীফ হাদীস গ্রহণ না করায় আহকামে ও ফাযায়েলে আ'মাল ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং সহীহ বা হাসান - যা রসূল ﷺ থেকে শুদ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে - তা ব্যতীত কোন কিছুতে কারো হুজ্জত বা দলীল নেই।' *(মুখতাসার আল-বায়েসুল হাযীয ১০১পৃঃ)*

আল্লামা আলবানী বলেন, 'সার কথা এই যে, এই শর্তের পালন কার্যতঃ যে হাদীস (শুদ্ধ বা সহীহ বলে) প্রতিপাদিত নয়, সেই হাদীস দ্বারা আমল ত্যাগ করতে বাধ্য করে। কারণ, সাধারণ মানুষের পক্ষে (যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের) 'অধিক দুর্বলতা জানা (ও চিহ্নিত করা) কঠিন। ফলতঃ এই শর্তারোপ করার অর্থ ও উদ্দেশ্যের সাথে যা আমরা এখতিয়ার করেছি তার প্রায় মিল রয়েছে এবং সেটাই উদ্দিষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় শর্ত থেকে একথাই বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে আমল যয়ীফ হাদীস দ্বারা নয়, বরং 'সাধারণ ভিত্তি' না থাকলে (কুরআন বা সহীহ সুন্নাহ হতে ঐ আমলের মূল বুনিয়াদ না থাকলে) যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল হয় না। অতএব এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এই শর্তের সাথে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা আপাতদৃষ্ট, বস্তুতঃ নয়। আর সেটাই অভীষ্ট।

তৃতীয়তঃ তৃতীয় শর্তটি হাদীসের দুর্বলতা জানা জরুরী হওয়ার ব্যাপারে প্রথম শর্তেরই

অনুরূপ। যাতে আমলকারী তা (সহীহ) প্রমাণিত বলে বিশ্বাস না করে বসে। অথচ বিদিত যে, যারা ফাযায়েলে যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে আমল করে তাদের অধিকাংশই হাদীসের দুর্বলতা চেনে না। আর এটা উদ্দেশ্যের বিপরীত।

পরিশেষে স্থূল কথা এই যে, আমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলিম জন সাধারণকে এই উপদেশ দিই যে, তাঁরা যেন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা আদপেই ত্যাগ করেন এবং নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত (সহীহ বা হাসান) হাদীস দ্বারা আমল করতে উদ্যোগী হন। যেহেতু তাতেই যা আছে যয়ীফ হাদীস থেকে অমুখাপেক্ষী করে। (আমলের জন্য তাই যথেষ্ট।) আর ওটাই রসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা বলায় আপতিত হওয়া (ও নিজের ঠিকানা জাহান্নাম করে নেওয়া) থেকে বাঁচার পথ। কারণ, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি যে, যারা এ বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে তারা উক্ত মিথ্যাবাদিতায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যেহেতু তারা প্রত্যেক সবল-দুর্বল (এবং জাল ও গড়া) হাদীস (এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেচ্ছা-কাহিনীকে হাদীস ধারণা করে তার দ্বারা) আমল করে থাকে। অথচ নবী ﷺ (এর প্রতি ইঙ্গিত করে) বলেন, "মানুষের মিথ্যাবাদিতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (অনুরূপভাবে যা পড়ে) তার সবটাই বর্ণনা করে।" *(মুসলিম)*

আর এর উপরেই বলি মানুষের ভ্রষ্টতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (বা পড়ে) তার সবটার উপরই (বিচার-বিবেক না করে) আমল করে। (যেহেতু চকচক করলেই সোনা হয় না।) *(দ্রষ্টব্যঃ সহীহুল জামেইস সাগীর, ভূমিকা ৪৯-৫৬পৃঃ, তামামুল মিন্নাহ, ভূমিকা)*

বলাই বাহুল্য যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত প্রমাণ হয় না।

আরো কিছু ফতোয়া ও যুক্তি

বাকী থাকল মুফতীগণের দলীলবিহীন ফতোয়া, তা কেউ মানতে বাধ্য নয়। যেমন ফাতওয়া রাহীমিয়া ও বেহেশ্তী গাওহারের কথা, হানাফী মযহাবের মুফতী আযমের ফতোয়া 'আহলে হাদীস'-এর জন্য মান্য হবে কেন? তাছাড়া তাঁদের দলীলও তো ঐগুলিই, যা নামাযের পর জামাআতী মুনাজাতের পক্ষপাতীগণ পেশ করে থাকেন।

আমরা 'আহলে হাদীস' আমরা কারো তকলীদ করি না, দলীল জেনে অনুসরণ করি মাত্র। ইবনে তাইমিয়্যাহ বা ইবনুল কাইয়েমের তকলীদ নয়। হাদীসের তকলীদ করেই দ্ব্যর্থবোধক 'দুবুর' শব্দের অর্থ নির্ধারণ করুন। এক আয়াত অন্য আয়াতের তফসীর করে, এক হাদীস অন্য হাদীসের ব্যাখ্যা করে। সুতরাং 'মুনাজাত' কোথায় হবে তা হাদীস দ্বারাই নির্ধারণ করুন। (এ ব্যাপারে পুস্তিকার প্রথমাংশ দেখুন।)

আমাদের জন্য বৈধ নয় দুআ জায়েয করার জন্য মুবারকপুরী (রহঃ)এর তকলীদ করা, যেমন বৈধ নয় মাগরেবের আগে দু' রাকআত নামায প্রমাণ করার জন্য তাঁর তকলীদ করা। যেহেতু তিনি ঐ নামাযকে বিদআত বলেননি। আমাদের উচিত, তাঁদের দলীল দেখে অনুসরণ করা।

বাকী থাকল, হাসান বাসরী ও তাঁর পড়শীর কথা। তা জানি না যে, সহীহ কি না? তাছাড়া তাতে হাত তোলার কথাও নেই। নচেৎ সেই 'আ-সা-র' কোন হাদীসগ্রন্থে আসেনি কেন? যে কোন ইতিহাস গ্রন্থ বা হাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা পেশ করে একটি স্বতন্ত্র ইবাদত প্রমাণ করা যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ সালামের ফযীলত এসেছে। এখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হল মসজিদে, নামাযের সালাম ফিরার পরে দেখছি আপনি আমার পাশে। আমি আপনাকে সালাম করলাম, মুসাফাহা করলাম। এটি জায়েয।

কেউ যদি বলে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর প্রত্যেক মুসল্লীর একে অপরের সাথে সালাম-মুসাফাহা করা জায়েয বা মুস্তাহাব। তাহলেই হবে মুশকিল। এখন যদি কোন সাহাবী বা তাবেয়ী

থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা এনে ফরয নামাযের পর সালাম-মুসাফাহা মুস্তাহাব প্রমাণ করতে চান, তাহলে তা নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য নয়; যতক্ষণ না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন বয়ান না পাওয়া যাবে। নিষেধ না থাকলেও ঐ অভ্যাস বিদআত বলে পরিগণিত হবে।

উনারা বলেন, **'দোয়া সুন্নতই, তা মামুর বেহি। তা আল্লা প্রদত্ত আমর বা আদেশ। যরুরী নাহলে হাদিসে বলা হয়েছে - নামাযে নেকী কম হয়। খেদাজ হয়, নাকেস হয়---।'**

জী, আম দুআ অবশ্যই তাই। নামাযের ভিতরের দুআও তাই। কিন্তু নামাযের পরে হাত তুলে জামাআতী দুআ ঐরূপ নয়; যেমন অনেকে ধারণা করতে পারেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন, "বান্দা যখন আমার কাছে দুআ চায়, তখন তার দুআ কবুল করে নিই।"

উনারা বলেন, **'এই আয়াতে, এই বাক্যে অপরিমিত সময় স্রোত, ক্ষুদ্রসীমায় বেষ্টিত করা হয় নাই। তা পরিলক্ষিত হয়।**

তাই ফরয নামায বাদে, ঐরূপ দোয়া না করার অলঙ্ঘনীয় দুর্ভেদ্য প্রাচির খাড়া হয়ে যায় না। ঐ বাক্যে, শব্দের প্রথমে এবং শব্দের শেষে, কোথাও কী না বাচক অব্যয় শব্দ আছে? কোরানের অন্য কোথাও কি মা, লা, লাইসা, লাম লান আছে কি? এই না বাচক শব্দ দিয়ে ঐ রূপ দোয়া নিষিধ্য হাদিস আছে কি? আন্নাহয়ো বা নিষেধ করা, আলমানয়ো বা মানা করা শব্দ কোথাও কি দেখা যায়?'

'এইরূপ বিদাত না জায়েয বলার কোনই প্রমাণ কোরান মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্য হতে একটি আয়াত বা নাবীর সহীহ হাদিস পেশ করতে পারবেন কী?'

এটি একটি সন্দিহান, যা উলামাদের মনে উদয় হওয়া উচিত নয়। কারণ, তাঁরা জানেন যে, কোন একটি স্বতন্ত্র ইবাদত প্রমাণ করতে স্বতন্ত্র দলীল লাগে। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا }

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(আহযাব ২১ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } (٥٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

তাঁরা এ কথাও জানেন যে, কোন জিনিসকে হারাম প্রমাণ করতে হলে 'নিষেধের দলীল' চাই। কিন্তু কোন ইবাদত প্রমাণ করতে হলে 'প্রমাণের দলীল' চাই; নিষেধের দলীল নয়। অর্থাৎ, নিষেধ না থাকলেই কোন স্বতন্ত্র ইবাদত প্রমাণ হয় না। আর এ কথা পূর্বেও আলোচিত হয়েছে।

আর বিদআত প্রমাণ করার জন্য সহীহ তো দূর কী বাত, কোন জাল হাদীসও পেশ করতে পারা যাবে না। নিষেধের হাদীস থাকলে তা তো বিদআত থাকত না, আর তখন উলামগণ তা 'বিদআত' না বলে 'নিষিদ্ধ' বা 'হারাম' বলতেন। যদিও বিদআত করা এক প্রকার তা-ই, তবুও পরিভাষায় তাকে 'বিদআত' বলা হতো না।

অবশ্য কোন আমলকে বিদআত প্রমাণ করার জন্য বড় প্রমাণ হল, তা শরীয়তে নেই। আর মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪০নং)* "যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮নং)*

মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আমার কাছে দোয়া করো, আমি তোমাদের দোয়াকে কবুল করে নেবো।"

উনারা বলেন, **'এই আয়াতেও সময়-সীমা নেই।'**

হ্যাঁ, আর তার জন্যই এই আয়াত দ্বারা প্রচলিত মুনাজাত প্রমাণ হয় না।

'ফরয নামাযের পরেই যে বাধার সময় সীমা চলে আসছে, তা কোরানে বলে না। কোরান বলে, পারলে যেভাবেই হোক দোয়া করো, তা আমি কবুল করে নিই।'

জী না, কুরআন তা বলে না। কুরআন বলে, রসূল তোমাদের নমুনা ও আদর্শ। তিনি যেমন করে ও যখন যেভাবে করবেন ও বলবেন, তেমনি করে কর।

কুরআন বলে নামায পড়; কুরআন এ কথা বলে না যে, 'পারলে যেভাবেই হোক নামায পড়ো।'

কুরআন বলে হজ্জ কর; কুরআন এ কথা বলে না যে, 'পারলে যেভাবেই হোক হজ্জ করো।'

তাহলে তো সব 'মাতুরীদী' মার্কা যার যা ইচ্ছা তাই শুরু হয়ে যাবে! ঐ সময়টা যিক্‌র-আযকারের সময়, তাই ভয় হয় যে, তা বাদ দিয়ে অথবা তার সাথে মুনাজাতের অনুষ্ঠান করলে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আদর্শের খিলাপ হবে এবং আমাদের আমল সেই হাদীস অনুযায়ী প্রত্যাখ্যাত হবে, যাতে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (শরীয়তের) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা ওর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত১৪০নং)* "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮নং)*

উনারা বলেন, 'রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ তিনটি কাজ, তা কারো পক্ষে করা হালাল বা বৈধ নয়। প্রথম কাজ, যে ব্যক্তি কোন গোত্রের ইমামতী করে, সে মুকতাদীদেরকে না নিয়ে দোয়া করে থাকে, তাহলে সে তাদের পক্ষ থেকে আমানতের খিয়ানত করল---। মিশকাত

---এখানে ইমামের কর্তব্যে যৌথ দোয়া করার যথেষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে। এটাই তো প্রচলিত সুন্নাত অনাদি কাল থেকে?!'

(ক) এ হাদীস থেকে নামাযের পর হাত তুলে যৌথ দুআ প্রমাণ হয় না।

(খ) ইমামের সাথে মুক্তাদীর সম্পর্ক সালাম ফিরা পর্যন্ত। সালাম ফিরা হয়ে গেলে নামাযও শেষ, ইক্তিদাও শেষ। অতএব দুআর খেয়ানত হলে হতে হবে নামাযের ভিতরে; নামাযের বাইরে নয়।

(গ) আদিহীন কাল (?) থেকে প্রচলিত সুন্নাতের খিলাপ করেছেন স্বয়ং আমাদের আদর্শ মহানবী ﷺ। সুতরাং জামাআতী নামাযের ইমামতি করেও বলেছেন, 'আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী---।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার---। 'আল্লাহুম্মাগফির লী--।' (আমাকে ক্ষমা কর।) কেবল নিজের জন্য একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। অনুরূপ আরো অন্যান্য দুআতেও তিনি একবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ নিশ্চয় তা খেয়ানত নয়।

(ঘ) আর তার মানেই হল, খেয়ানতের ঐ হাদীস আমলযোগ্য নয়।

এ হাদীসের ব্যাপারে মুহাদ্দিস আলবানী হাদীসটি অশুদ্ধ প্রমাণ করে কি বলছেন শুনুন ঃ-

وقد حكم ابن خزيمة على الشطر الثاني من الحديث بالوضع وأقره ابن تيمية وابن القيم وذلك لأن عامة أحاديث النبي ﷺ في الصلاة - وهو الإمام - بصيغة الإفراد وقد سبق بعضها في الكتاب (٣٢١/١) فكيف يصح أن يكون ذلك خيانة لمن أمهم ؟

হাদীসের দ্বিতীয় অংশটিকে ইবনু খুযাইমা 'জাল' বলে অভিহিত করেছেন এবং এ ফায়সালায় ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল কাইয়েম (রঃ) ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। যেহেতু নবী ﷺ-এর ইমাম অবস্থার অধিকাংশ (দুআর) হাদীস একবচন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যার কিছু হাদীস (ও দুআ) এই কিতাবের (১/৩২১)এ পার হয়ে গেছে। অতএব এ কথা কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে যে, তিনি যাদের ইমামতি করেছেন, তাদের খিয়ানত করেছেন? *(তামামুল মিন্নাহ ১/২৭৮)*

উনারা একটি দামী কথা বলেছেন, যে কথা ফরয নামাযের পর মুনাজাত-বিরোধীরাই বলে থাকেন; **'সর্বসম্মতিক্রমে ওলামায়ে ওসুলীনগণের নিকট হতে প্রমাণিত যে, আম শব্দের বিধানকে আম রাখতে হবে, দলীল ছাড়াই তাকে নির্দিষ্ট করা যাবে না। (কোরআন মাজীদ, উর্দু অনুবাদ, ব্যাখ্যা সহ সউদী আরবের ছাপা। শাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয এর পক্ষ থেকে। ৮৩পৃঃ।)'**

তাঁরা বলেন, দুআর তাকীদ ও ফযীলত ইত্যাদি যা আমভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা কোন দলীল ছাড়া কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা যাবে না। যেমন শায়খ ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেছেন।

আসলে এ হক কথা ঐ তফসীর থেকে উনাদের কলমে ফস্কে গেছে। নচেৎ তফসীরের বক্তব্য তা নয়। তফসীরের বক্তব্য প্রণিধান করুন ঃ-

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ } (٢٠٧) سورة البقرة

পক্ষান্তরে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিক্রয় করে দেয়।

এই আয়াত সম্পর্কে বলা হয় যে, সুহায়ব রূমী ﷺ-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যখন তিনি হিজরত করেন, তখন মক্কার কাফেররা বলল, এই ধন-সম্পদ এখানকারই উপার্জিত বিধায় আমরা তা সাথে করে নিয়ে যেতে দিবো না। সুহায়ব ﷺ সমস্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ ক'রে দ্বীন নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ঘটনা শুনে বললেন, "সুহায়ব অতীব লাভদায়ক ব্যবসা করেছে।" কথাটি তিনি দু'বার বলেছিলেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* কিন্তু এ আয়াতও ব্যাপক অর্থের, যা সমস্ত মু'মিন, আল্লাহভীরু এবং দুনিয়ার মোকাবেলায় দ্বীনকে প্রাধান্য দানকারী সকলকেই শামিল করে থাকে। কেননা, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হওয়া সমস্ত আয়াতের ব্যাপারে নীতি হল, العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السـبب. 'বাচ্যার্থের ব্যাপকতাই লক্ষণীয়, অবতীর্ণের কারণবিষয়ক ঘটনার বিশেষত্ব নয়'। অর্থাৎ, আয়াতের যে অর্থ তার ব্যাপকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে, বিশেষ কোন কারণে নাযিল হয়ে থাকলেও অর্থ কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে না। সুতরাং আখনাস বিন শুরাইক (যার কথা পূর্বের আয়াতে এসেছে) মন্দ চরিত্রের একটি নমুনা। যারাই এই চরিত্রের অধিকারী হবে, তারা সকলেই তার শ্রেণীভুক্ত হবে। অনুরূপ যারা উত্তম গুণাবলী এবং পূর্ণ ঈমানের গুণে গুণান্বিত হবে, তাঁদের সকলের জন্য নমুনা হবেন সুহায়ব ﷺ।

পক্ষান্তরে ইবাদত ও আহকামের ক্ষেত্রে নীতি ভিন্নরূপ, যেরূপ হুযুর তফসীর থেকে বুঝেছেন। অবশ্য ঐ বুঝের ব্যাখ্যায় যা বুঝাতে চেয়েছেন, তা এই নীতির পরিপন্থী। আল্লাহর রসূল ﷺ সর্বদা যিক্র করতেন বলে আপনি পারেন কি প্রত্যেক নামাযের পরে জামাআতবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিক্র করতে। আপনি পারলেও আল্লাহর নবী ﷺ-এর সাহাবী ইবনে মাসঊদ তা বিদআত বলেছেন; যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

জামাআতী মুনাজাতের প্রমাণ

১। উনারা বলেন, **'দোয়া তো ইবাদাত, একা করতে পারে, সবাই মিলে করতে পারে। ইজতেমায়ী দোয়া বেশী কবুল হয়।'**

অবশ্য কেবল ধারণা ও ইচ্ছামতে নয়; প্রমাণ মতে। মিশকাতের বাবুল ইল্মে যে হাদীস তার প্রমাণে পেশ করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা পড়ে আপনিই বিচার করুন, তাতে কি 'ইজতেমায়ী দোয়া বেশী কবুল হয়' প্রমাণ করে? হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ-

ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعـــوتهم تحيط من ورائهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل

এর তর্জমা করা হয়েছে, 'মুসলমানদের জামাআতকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরো, কারণ তাদের **সম্মিলিত** দোয়া তাঁদের পশ্চাৎ দিক থেকে (বালা মসিবত) আটকে রাখে।'

হাদীসের শব্দাবলীর মধ্যে কোন্ শব্দটির তর্জমা **'সম্মিলিত'**? এটা কি মতলব হাসেলের জন্য নিজের পকেট থেকে বাড়ানো নয়?

এবারে হাদীসের বিভিন্ন শব্দ লক্ষ্য করুন ঃ-

ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصـــحة ولاة المـــسلمين ، ولـــزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. المعجم الأوسط للطبراني - (ج ١٢ / ص ٢٨)

ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن : إخلاص العمل لله ، والطاعة لذوي الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. المستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج ١ / ص ٢٨٤)

فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ ، تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ. المعجم الكبير للطبراني - (ج ٢ / ص ١٦٤)

فإن دعوتهم تكون من ورائهم. المستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج ١ / ص ٢٨٥)

والنصيحة لولى الأمر ولزوم الجماعة، فان دعوتهم تكون من ورائه. مسند الإمام أحمـــد بـــن حنبـــل بأحكام شعيب الأرناؤوط - (ج ١٦ / ص ٢٠٨) أي من وراء ولي الأمر.

(ক) লক্ষ্য করুন যে, হাদীসে উল্লেখিত 'মুসলমানদের জামাআত' মানে কোন সংগঠন নয়, কোন মসজিদের জামাআত নয়। বরং ঐ জামাআত থেকে উদ্দেশ্য এক রাষ্ট্রনেতার অধীনে দেশের সমগ্র জামাআত বা জাতি। সেই জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করা হয়েছে।

(খ) হাদীসে উল্লেখিত 'দাওয়াত' মানে 'দোয়া' নয় এবং জামাআতী দোয়াও নয়; যেমন বুঝানো হয়েছে। বরং তার মানে বাদশা বা শাসকের আহবান। প্রণিধান করুন মুহাদ্দিসীনদের ব্যাখ্যা ঃ-

وأما قوله: (فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو هي من ورائهم محيطة) فمعناه عند أهل العلـــم أن أهـــل الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم و لم يكن لهم إمام فأقام أهل ذلك المصر الذي هـــو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن كل من خلفهم وأمامهم من المـــسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن معلنا بالفسق والفساد معروفا بذلك، لأنهـــا دعوة محيطة بهم يجب إجابتها ولا يسع أحدا التخلف عنها لما في إقامة إمامين مـــن اخـــتلاف الكلمـــة وفساد ذات البين. التمهيد لابن عبد البر — (ج ٢٢ / ص ١٠٨ -١٠٩)

ইবনে আব্দুল বার্র বলেন, উলামাগণের নিকট **'ফাইন্না দাওয়াতাহুম তোহিতো মিন অরায়েহিম'**-এর অর্থ এই যে, মুসলিমদের কোন রাষ্ট্রের জামাআতের ইমাম (রাষ্ট্রনেতা) মারা গেলে এবং তাদের ইমাম না থাকলে যখন ঐ ইমামহীন রাষ্ট্রের লোকেরা তাদের জন্য একজন ইমাম নির্বাচন করবে; তাঁর ব্যাপারে একমত হবে, তাঁকে নিয়ে সন্তুষ্ট হবে, তখন তাদের পশ্চাতে ও সামনে দূর-দূরান্তে যে সকল মুসলমান থাকবে, তাদের জন্য ঐ ইমামের আনুগত্যে প্রবেশ করা জরুরী হবে; যদি তিনি প্রকাশ্যরূপে পাপাচার ও ফাসাদে লিপ্ত না থাকেন এবং তাতে পরিচিত না হন। কারণ (তাঁদের) আহবান তাদেরকে (ঐ দূরবর্তী মুসলমানদেরকে) পরিবেষ্টন করে থাকে। সে আহবানে সাড়া দেওয়া ওয়াজেব। সে আহবানে সাড়া না দিয়ে পিছিয়ে থাকার কারো অবকাশ নেই। যেহেতু (তারা ঐ ইমাম না মেনে অন্য ইমাম মানলে) দুজন ইমাম নির্বাচনে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। *(তামহীদ ২২/১০৮-১০৯)*

বুঝতেই পারছেন যে, কোথায় নানীর কবর, আর কোথায় আমরা কাঁদছি?

২। উনারা বলেন, **'সহীহ হাদীসের আম দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, নাবী (সাঃ) জামাআত সহকারে দুই হাত তুলে দুআ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ঐ দুআর প্রতি আ-মীন - আ-মীন ।। বলেছেন।'**

জী হ্যাঁ। তাঁর সুন্নাহর অনুসরণে সেই দুআ করুন যা সহীহ হাদীসে প্রমাণ আছে। খুতবার

ইস্তিস্কায় ও কুনূতে নাযেলায় হাত তুলে জামাআতবদ্ধভাবে সেই দুআ করুন। তা বলে এই দেখে আরো অন্য জায়গায় 'নকল আবিষ্কার' করবেন, তার অনুমতি শরীয়তে নেই।

৩। **'হাবীব বিন মাসলামাহ ফেহরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি লোকদেরকে বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এই বলতে শুনেছি, কোন সময়ে লোকদের একটি জামাআত একত্রিত হয়ে তাঁদের মধ্যে থেকে একজন দুআ করেন এবং বাকি লোকগণ ঐ দুআর প্রতি ।। আ-মীন! আ-মীন! বলতে থাকেন। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ঐ দুআকে কবুল করে নেন। (ফাতহুল বারী ১১/২৪০)'**

এ হাদীসটি আমভাবে ইজতিমায়ী দুআ প্রমাণ করে। অবশ্য খাস দুআ ফরয নামাযের পর নয়। পরন্তু এ হাদীস যয়ীফ তথা দলীলযোগ্য নয়। *(দেখুনঃ যয়ীফ তারগীব, আলবানী ১/৭০)*

৪। **আমাদের পূর্বের নবীগণ (মূসা ও হারূন)ও দুআ করেছেন এবং দুআর প্রতি 'আমীন-আমীন' বলেছেন, তাহলে আমাদের চলবে না কেন?**

অত দূরে কেন যেতে হবে, আমরা তো বলছি, আমাদের নবী ﷺ ও সাহাবাগণও দুআ করেছেন এবং 'আমীন-আমীন' বলেছেন, কিন্তু সেই দিয়ে তো আর 'ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী দুআ প্রমাণ হয় না।

৫। **'ফরয নামায পর জামায়াত সহকারে দুই-হাত উঠিয়ে দুআ করা বিষয়ে রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর কয়েকশত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হতে প্রমাণিত আছে।'**

না'রায়ে তকবীর! আল্লাহু আকবার! তাহলে আবার কি? কিন্তু এ প্রমাণ আছে কোথায়? বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআহ, মাসানিদ, জাওয়ামে' বা কোন মুস্তাদরাক হাদীসগ্রন্থে? না না, তা আছে 'আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়াহ' ৬ খন্ডে! বাহরীন (?) জয়লাভের সময় ফজরের ফরয নামায পর তাঁরা দুই হাঁটু পেতে বসেন।

তার মানে নামায পড়ে উঠে গিয়ে তারপর আবার হাঁটু পেতে বসেছিলেন। আর তাহলে তা ফরয নামায পর তো হচ্ছে না।

বাহরাইনের মুর্তাদ যুদ্ধে আল-আ'লা ইবনুল হাযরামী এবং তাঁর সাথীগণ পানিশূন্য মহাসঙ্কটের সময় ফজরের নামাযের পর হাঁটু গেড়ে (না বসে, না দাঁড়িয়ে) সূর্য ওঠা পর্যন্ত দুআ করেছিলেন বলে ইবনে কাষীর বিনা সনদে ঐ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনা মেনে নিয়ে ইবাদতের একটি পদ্ধতি প্রমাণ করতে পারেন না। যেমন এই মুনাজাতে আরো একটি পদ্ধতি সংযোজিত হয়েছে, যা আপনিই হয়তো মেনে নেবেন না; আর তা হল, (جثا علـى ركبتيـه) হাঁটু গেড়ে, পাছা তুলে, না পূর্ণ বসে এবং না খাড়া হয়ে মুনাজাত। জানি না, তাও সহীহ কি না? 'আল-বিদায়াহ অন্নিহায়াহ' কোন হাদীস গ্রন্থ নয়; এটি একটি ইতিহাস ও কেচ্ছা-কাহিনীর বই; পরন্তু বিনা সনদে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কত সনদযুক্ত হাদীস দুর্বল বলে রদ্দ করা হয়, আর এ তো বিনা সনদের একটি বিচ্ছিন্ন ও বিরল ঘটনামাত্র। তা দিয়ে কি আর প্রাত্যহিক পঞ্চ-মুনাজাত প্রমাণ হয়?

৬। **'বোখারী ও মুসলীম শরীফে একটি বড় হাদীসে বর্ণিত আছে, --- মানুষ যখন একত্রিত হয়ে যিকির করে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের দুআ করে। তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশ্তাদেরকে বলেন যে, তোমরা স্বাক্ষী থেকো। আমি তাঁদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিলাম। (মিশকাত)'**

এ হাদীস দ্বারা জামাআতী যিক্র বা ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ প্রমাণিত হয় না। হাদীসে সেই মজলিস উদ্দিষ্ট, যাতে আল্লাহর যিক্র থাকে। যেমন, তসবীহ-তাহলীল-তকবীর, দুআ, কুরআন তেলাঅত, হাদীস পাঠ, ইসলামী জালসা ইত্যাদি।

বহুবচন শব্দ ব্যবহার

উনারা বলেন, আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের দুআ কবুল করব। **'তোমরা' বহুবচন শব্দই প্রমাণ করে যে, জামাআতী বহু লোকের দুআ আল্লাহ কবুল করবেন।**

কিন্তু জমার সীগা মাত্রই জামাআত প্রমাণ করে না। সম্বোধিত মানুষ যদি দুয়ের অধিক হয় তাহলে ফে'ল বা ক্রিয়াকে জমা বা বহুবচন ব্যবহার করা হয়। অতঃপর কার্যক্ষেত্রে সে কাজ একাকীও হতে পারে অথবা জামাআতী। আর তার জন্য পৃথক দলীল লাগে, অতিরিক্ত অব্যয় লাগে। যেমন,

{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} (٤٣) سورة البقرة
{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} (١٠٣) سورة آل عمران
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} (٦١) سورة النـــــور

সুতরাং কোন আদেশ হলে, তা পালন করা এককভাবে হবে, না জামাআতবদ্ধভাবে হবে তার অতিরিক্ত দলীল বা অব্যয় চাই। এটাই হল আরবী ভাষায় নিয়ম, শরীয়তের নীতি। যেমন,

{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} (١١٠) سورة البقرة

তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।

{وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ} (٣١) سورة الأعراف

তোমরা পানাহার কর।

{وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ} (٩٠) سورة هود

তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁর নিকট তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর।

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (٦٠) سورة غافر

তোমরা আমার কাছে দুআ কর, আমি তা কবুল করব।

এ সবের অর্থ এ নয় যে, তোমরা এ সব কাজ একাকী কর অথবা জামাআতবদ্ধভাবে কর।

এ সকল কাজের মূল হল একা একা অথবা জামাআতবদ্ধভাবে করার জন্য পৃথক পথনির্দেশের দরকার; যা মহানবী ﷺ-এর সহীহ সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত হবে।

সুতরাং 'তোমরা আমার কাছে দুআ কর, আমি তা কবুল করব।' এই আয়াতে বহুবচন শব্দ আছে অতএব তার অর্থ হবে, তোমরা (সবাই মিলে) আমার কাছে দুআ কর, আমি তা কবুল করব। তোমরা (জামাআতবদ্ধভাবে) আমার কাছে দুআ কর, আমি তা কবুল করব।

নচেৎ জমা বা বহুবচনের সীগা বা পদ থাকলেই যদি 'একসঙ্গে কর' বা 'জামাআতবদ্ধভাবে কর' অর্থ হয়, তাহলে অর্থে বিকৃতি ও অসম্ভাব্য পরিলক্ষিত হবে। যেমন,

{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} (٣) سورة النساء

সুতরাং নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার (জামাআতবদ্ধভাবে) বিবাহ কর।

{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٢٢٣) سورة البقرة

তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ, সুতরাং তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা (জামাআতবদ্ধভাবে) গমন কর!!!

{فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} (١٨٧) سورة البقرة

--- সুতরাং তোমরা এখন তাদের সাথে (জামাআতবদ্ধভাবে) সঙ্গম কর!!!

{فَطَلِّقُوهُنَّ} (١) سورة الطلاق

তাদেরকে (জামাআতবদ্ধভাবে) তালাক দাও।

{وَآتُواْ الزَّكَاةَ} (٤٣) سورة البقرة

তোমরা (জামাআতবদ্ধভাবে) যাকাত প্রদান কর।

{وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } (٤٢) سورة الأحزاب
তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় (জামাআতবদ্ধভাবে) তাঁর তসবীহ পড়।
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ --- وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ } (٦) سورة المائدة
তোমরা (জামাআতবদ্ধভাবে) ওযূ কর ---- গোসল কর।
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } (٥٦) سورة الأحزاب
হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর উপর (জামাআতবদ্ধভাবে) দরূদ ও সালাম পড়।
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } (٩) سورة الجمعة

জুমআর আযান হলে তোমরা (জামাআতবদ্ধভাবে) আল্লাহর যিক্রের জন্য সত্বর যাও এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন কর।

ইত্যাদি। আশা করি এ অনুবাদ কেউ করবেন না। কারণ জামাআত প্রমাণ করার জন্য অতিরিক্ত অব্যয় অথবা দলীল প্রয়োজন হবে। বিধায় এ আয়াত দিয়ে জামাআতী দুআ প্রমাণ হবে না।

তাছাড়া জামাতের সাথে নয়, বরং একাকী দুআ করলেও মহান আল্লাহ কবুলের ওয়াদা দিয়েছেন। ঐ দেখুন, মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। (কেউ আমার কাছে দুআ করলে, আমি তার দুআ কবুল করি।)

এখানে একবচন শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন দুআয় কোথাও একবচন এবং কোথাও বহুবচন শব্দ ব্যবহার হয়েছে, আর তার মানে এই নয় যে, দুআ একাকী করতে হবে অথবা জামাআতবদ্ধভাবে করতে হবে। কিভাবে করতে হবে, তা বলে দেবেন প্রেরিত দূত নবী ﷺ। বলা বাহুল্য, **'সূরা মু'মিনের ৬০নং ক্রিয়াগুলি বহুবচন দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে'** বলেই জামাআতী মুনাজাত প্রমাণ হয় না; পরন্তু ফরয নামাযের পর তো নয়ই।

অপবাদ ও তার অপনোদন

(১) যারা মুনাজাত করে না, তারা আবূ জেহেল

এখানে যারা দুআ করতে নিষেধ করে তাদেরকে আবু জেহেল বলা হয়েছে। কারণ আবূ জেহেলই সালাত রূপ দুআ করতে নিষেধ করত।

আর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা নামায পড়তে নিষেধ করে না, দুআও করতে নিষেধ করে না; বরং ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআকে শরীয়তে নেই বলে, শরীয়তে নব-আবিষ্কৃত বলে, বিদআত ও বর্জনীয় বলে। তারাও আবূ জেহেল।

{سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ }

এটি একটি ঝাল ধরানো অপবাদ! কিন্তু আবুল ইল্‌মরা তো দুআ করতে মানা করেন না। বরং ঐ সালাতরূপ দুআ করতেই আদেশ করেন, নিষেধ করেন না। যেহেতু নামাযই হচ্ছে দুআ। নামায দুই শ্রেণীর দুআ দিয়ে সুসজ্জিত, সুবিন্যস্ত; (১) দুআয়ে যিক্র (যাতে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়) ও (২) দুআয়ে মাসআলাহ (যাতে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া হয়)। নামাযী যখন নামায পড়ে, তখন সে প্রভুর সাথে মুনাজাত করে। নামাযের ভিতরে ৮ জায়গায় প্রার্থনামূলক মুনাজাত করা হয়; যেমন পূর্বেই জেনেছেন।

আবুল ইল্‌মরা নামাযের পরেও দুআ করতে নিষেধ করেন না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

(فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم)

অর্থাৎ, তারপর যখন তোমরা নামায শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। *(সূরা নিসা ১০৩ আয়াত)*

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'বাবুদ দুআই বা'দাস স্বালাহ' শিরোনামা বেঁধে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তাতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের পর দুআ হল, দুআয়ে যিক্‌র।

ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী দুআও জুমআহ ও ঈদের খুতবায় করেন ও করতে বলেন, ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামাআতী হাত তুলে দুআও ইস্তিস্কা ও কুনূতে নাযেলায় করেন ও করতে উদ্বুদ্ধ করেন। কারণ সেসব শরীয়ত-সম্মত।

যা শরীয়ত-সম্মত নয় বলেন, তা হল নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী দুআর অনুষ্ঠান। আর তা শুধু এই ভয়ে যে নির্মল দ্বীনে যেন ভেজাল থেকে না যায়। আর তাতেই কি তাঁরা আবু জেহেল বা তার মত হয়ে গেলেন?

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } (٧٠) سورة الأحزاب

(২) যারা মুনাজাত করে না, তারা ক্বাদারী

উনারা বলেছেন, **'এঁরা তকদীরে বিশ্বাসী। (ক) যারা তাকদিরে বিশ্বাসী তাদেরকে অনেকে কাদরিয়া বলে। (খ) অনেক আরেফ বিল্লা দোয়াই করে না - নসিবের উপর ছেড়ে দেয়।--- (গ) হাদিস বুখারীতে একটা অধ্যায় কাদরিয়া বলে আছে। (ঘ) এমন কি এই গোত্র দোয়ায় একা একা হাতও তুলে না। (ঙ) এঁদের নিকট হাত তুলে দোয়া শেষে মুখমণ্ডলে মাসাহ বা মুখে হাত বুলানো নাই।'**

(ক) যারা তাক্বদীরে বিশ্বাসী তাদেরকে 'কাদরিয়া' কেউ বলে না। তাক্বদীরে বিশ্বাসী আপনিও। তাক্বদীরে বিশ্বাস না করলে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। অবশ্য সেই সাথে তদবীরেও বিশ্বাস রাখতে হবে। যারা তকদীরে অবিশ্বাসী, যারা বলে তকদীর বলে কিছু নেই, তাদেরকেই 'ক্বাদারিয়াহ' বলে। যেহেতু তারা তদবীরের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে যারা কেবল তাক্বদীরে বিশ্বাসী ও তদবীরে অবিশ্বাসী তাদেরকে 'জাবারিয়্যাহ' (অদৃষ্টবাদী) বলে।

(খ) আপনার ধারণা কি 'কাদরিয়া' দুআ করে না? কিন্তু আরেফ বিল্লাহ তো কাদরিয়ার বিপরীত। যারা নসীবের উপর ছেড়ে দেয়, তারা তো জাবারিয়্যাহ।

(গ) 'হাদিস বুখারীতে একটা অধ্যায় কাদরিয়া বলে আছে।' তাতে কি হয়েছে? তাতে কি বলা হয়েছে, 'কাদরিয়া' তাকদীরে বিশ্বাসী, অথবা তারা দুআতে হাত তুলে না, অথবা দুআর পরে মুখমণ্ডল মাসাহ করে না?

(ঘ) 'এই গোত্র' বলতে উদ্দেশ্য কারা? কাদরিয়ারা, নাকি তাঁরা, যাঁরা ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ বিদআত বলছেন? নাকি আপনার মতে তাঁরাও কাদরিয়া ও আরেফ বিল্লাহ?

(ঙ) এ কাজও কি কাদরিয়াদের? সমাজকে কি বুঝাতে চেয়েছেন? সমাজের শিক্ষিত মানুষরা কি এই শ্রেণীর লিখাকে ক্ষমার চোখে দেখবে? পক্ষান্তরে গোলেমালে উদ্দেশ্য যদি তাঁরা হন, যাঁরা ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ বিদআত বলছেন, তাহলে আপনার কথাতেই বুঝা গেল তাঁরা হাত তুলে দুআ করেন। আর দুআ শেষে মুখমণ্ডলে এই জন্য হাত বুলান না যে, তাঁরা হলেন, আহলে হাদীস। যেহেতু দুআর পরে মুখমণ্ডল মাসাহ করার প্রমাণে কোন সহীহ দলীল নেই। এ ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে, সবক'টি যয়ীফ।

আপনি এই আহলে হাদীসের দ্বিতীয় জামাআতের ব্যাপারে যদি জানেন যে, (আরেফ বিল্লাহর মত) সত্যই তারা কোন সময় দুআ করে না, তাহলে জানতে হবে আপনার জ্ঞান বড় সীমিত।

আর যদি জানেন যে, তারা ফরয নামাযের পরে দুআয়ে যিক্র করে থাকে এবং অন্য সময়ে দুআয়ে মাস্আলাহ করে থাকে, তারা পলকের জন্যও মহান প্রতিপালকের রহমত থেকে অমুখাপেক্ষী নয়, বরং প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর দয়ার মুখাপেক্ষী, তকদীরে বিশ্বাস রেখে তদবীর করে এবং তারা সকাতরে প্রার্থনা করে, যথাসময়ে তারা রবের রহমত যাচনা করে, তাহলে জেনেশুনে তাদেরকে 'কাদরী' (বা সঠিক অর্থে ঃ জাবারী) বানানো একটি মিথ্যা ও জঘন্য অপবাদ। এ অপবাদ লিখিত প্রচার-পত্রে ভুল স্বীকার ছাড়া কেউ ক্ষমা করবে না।

আর যদি উদ্দেশ্য অপবাদ না হয়, তাহলে এই আলোচনায় 'কাদরিয়া'র কথা আনার কি প্রয়োজন ছিল?

(৩) যারা মুনাজাত করে না, তাদের মূর্খামি ও ফিতনা

উনারা বলেন, 'দুআ বিষয়ে দ্বীনের বহু উৎস কোরআন মাজীদ ও সহী হাদিস থাকা সত্ত্বেও ------- যদি ফরয নামাযের পর জামাআতী দুআকে বিদআত বলে, তবে সেটা মূর্খামি ও ফিৎনা ছাড়া আর কি হতে পারে? বর্তমানে যাঁরা ফরয নামাযের পর ঈমাম ও মোক্তাদীগণের মিলিত দুআকে বিদআত ও না জায়েয বলছেন, তাঁরা সত্যিকারই বিপথগামী এমং মুসলীম সমাজকে বিভ্রান্তকারী!!!!!!'

هكذا مرة واحدة؟ {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ }

এক বাক্যে মূর্খামি? ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ মূর্খ? ইমাম ইবনুল কাইয়েম মূর্খ? সউদী আরবের ফকীহ ও মুফতীগণ মূর্খ? আল্লামা আলবানী, ইবনে বায, ইবনে উষাইমীন, এঁরা সবাই মূর্খ? হারামাইনের ইমামগণ, হাইআতু কিবারিল উলামা, ফাতাওয়া বিষয়ক আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, জামেআহ ইসলামিয়াহ, জামেআতুল ইমাম, জামেআতুল মালেক সঊদ, (সউদী আরব) জামেআহ সালাফিয়া বানারস, জামেআহ ইবনে তাইমিয়্যাহ বিহার, জামেআহ সানাবেল দিল্লী প্রভৃতি বিশ্বের অন্যান্য সালাফী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ মূর্খ? শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী মূর্খ? হাফেয শায়খ আইনুল বারী আলিয়াবী মূর্খ? দেশের মাদানীগণ সবাই মূর্খ? তাঁরা সবাই বিপথগামী এমং মুসলীম সমাজকে বিভ্রান্তকারী? অল্লাহি হাযা আজীব! এ যেন,

رمتني بدائها وانسلت.

প্রতিপক্ষকে ক্ষান্ত করতে এই শ্রেণীর গালাগালি করা ও কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি করা উলামার অভ্যাস নয়। আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী কাউকে মূর্খ বলেননি। যেহেতু যাঁরা উচ্চ পর্যায়ের আলেম তাঁদের মাঝে আদব থাকবে, তাঁরা অপর আলেমকেও শ্রদ্ধা করবেন।

إنما يعرف من الناس ذا الفضل ذوه.

কোথায় কুরআনের সেই দুআর আদব? যেখানে বলা হয়েছে,

{وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا } (١٠) سورة الحشر

আর ফিতনা ছড়ানোর কথা বলছেন? উলামাগণ কখনো ফিতনা ছড়ান না। গভীর জলের মাছদের মধ্যে এই শ্রেণীর ফরফরানি দেখা যায় না। কিন্তু অল্প জলে পুঁটি মাছ ফরফর করে। ফাঁপা ঢেকির শব্দ বড়। খালি গাড়ির শব্দ বেশী। উভয় পক্ষের অল্পশিক্ষিত গোঁড়ারাই ফিতনা ছড়ায়। যারা জোর করে নিজের মত অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়, তারাই ফিতনা ছড়ায়। যারা দুআ করলে অথবা না করলে ইমামতি করতে বাধা প্রদান করে তারাই ফিতনাবাজ। যারা ফরয নামাযের পর মুনাজাত জরুরী মনে করে, যারা কেউ দুআ না করলে তাকে দুআ করতে আদেশ করে, অথবা কেউ তা করলে জোরপূর্বক বাধা দেয় তারাই ফিতনাবাজ। যারা তাদের ফতোয়া না মানলে অপর পক্ষকে জাহেল, সুবিধাবাদী, বিদআতী ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ করে ও সমাজকে উস্কিয়ে থাকে, সমাজের চোখে তাদেরকে ছোট করে নিজেকে 'হিরো' ও অপরকে 'জিরো' প্রমাণ করে

বেড়ায়, ফিতনাবাজ তারাই। যারা নিজেদের মর্যাদা বিলীয়মান এবং অপরের মর্যাদা বর্ধমান দেখে হিংসায় জ্বলে বিরোধিতায় তৎপর, আসলে তারাই ফিতনাবাজ। যারা ফরয নামাযের পর মুনাজাত করলে অথবা না করলে সিধা জাহান্নামে পাঠিয়ে থাকে, ফিতনা ছড়ায় তারাই।

তাছাড়া পূর্বেই বলা হয়েছে, দুআর দলীল দিয়ে ফরয নামাযের পর জামাআতী দুআকে প্রমাণ করা জ্ঞানবত্তা নয়। যেমন দরূদের দলীল দিয়ে ফরয নামাযের পর জামাআতী দরূদ প্রমাণ করাও পান্ডিত্য নয়। তসবীহর ভূরি ভূরি দলীল উপস্থিত করে রোযা ইফতারীর পরে জামাআতী তসবীহ প্রমাণ করাও কোন 'শাইখুল হাদীস'-এর কাজ নয়।

(৪) হাত তুলে দুআর সমস্ত হাদীস যয়ীফ শুনে উনারা বলেন, যারা ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ বিদআত বলছে, তারাও অনেক যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করে।

এটিও কিন্তু একটি অপবাদ। কারণ তারা জেনেশুনে কোন সময়েই যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করে না। যে সকল উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, সে সকল হাদীসকে কেউ কেউ যয়ীফ বললেও আসলে অন্য সূত্রে অথবা সমষ্টিগত সূত্রে তা সহীহ লেগায়রিহ, হাসান অথবা হাসান লেগায়রিহ; যা মুহাদ্দিসীনদের নিকটে আমলযোগ্য।

সঊদী আরবে ফজরের সময় দুআয়ে কুনূত শুনে থাকলে, তা সত্য। কিন্তু তা ঐ কুনূত নয়, যা নিয়মিত শাফেয়ীরা করে থাকে এবং যা আমাদের নিকট বিদআত। বরং তা দুয়ের মধ্যে এক। হয় রমযানের কিয়ামুল লাইলের কুনূত। আর না হয় কুনূতে নাযেলার কুনূত। আর এ ক্ষেত্রে কেবল ফজরের নামাযেই হয় না, বরং অন্য নামাযেও হয়। যেমন বোসনিয়া, ইরাক ও ফিলিস্তীনের মুসলিমদের জন্য যথাসময়ে হয়েছিল।

(৫) যারা মুনাজাত করে না, তারাই বিদআতী

উনাদের কেউ কেউ বলেন, **'ফরয নামায বাদে, যৌথ ও একা হাত তুলে দোয়া করাকে যারা বিদাত বলেন, তারাই বিদাতী!'**

এটা হল সেই শ্রেণীর অপবাদ, যা গায়ের ঝাল ঝাড়ার জন্য বলা হয়। যেমন একটি লোক এক মহিলার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে গালি দিয়ে বলল, 'চুপ কর শালী।' তখন পাল্টা জবাবে মহিলাটিও রেগে তাকে বলল, 'তুই চুপ কর শালা!'

অনেক সময় মাতালকে 'মাতাল' বললে পাল্টা জবাবে মাতালও ভালো মানুষকে 'মাতাল' বলে গালি দিয়ে থাকে।

আসলে 'বিদআত' ও 'বিদআতী'র সংজ্ঞা অনুসারে এঁরা বিদআতী না হলেও পাল্টা জবাবে এঁদেরকে অপবাদ দিয়ে গায়ের ঝাল ঝাড়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

উনারা বলেন, **'তাদের কথাগুলি নিজ নিজ মনগড়া একটি নতুন বিদআত। কারণঃ কোরআন মাজীদ এবং সহীহ হাদিস দ্বারা জামায়াত সহকারে দুআ করার কথা প্রমাণিত আছে এবং নাবী (সাঃ) উম্মতগণকে জামায়াত সহকারে দুআ করার উৎসাহ দান করেছেন।'**

এই জন্য যে যে জায়গায় আল্লাহর নবী ﷺ ও সাহাবাগণ জামাআত সহকারে দুআ করে গেছেন, কেবল সেই সেই জায়গায় জামাআত সহকারে দুআ সুন্নত। পক্ষান্তরে ফরয নামাযের 'পরের সময়টা' দুআ কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময় যদিও বলে গেছেন, তবুও তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ দৈনিক পাঁচ অক্ত নামাযের মধ্যে একটিবারও কোন নামাযের পর জামাআতী মুনাজাত করে যাননি। বিশাল জামাআতের এই মুনাজাতের কথা কোন সাহাবী বর্ণনা করলেন না। অথচ তাঁরা জামাআতী নামাযের কত খুঁটিনাটি মাসায়েল বর্ণনা করে গেছেন। আল্লাহর নবী ﷺ-এর জীবনে যা মাত্র দু'-একবার ঘটেছে তারও সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন তাঁরা, অথচ এতবড় একটি

ফযীলতপূর্ণ জিনিস, যা মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে পাঁচ পাঁচবার অনুষ্ঠিত হত, তার কথা একবারও কেউ বলে গেলেন না, এটা কি ভাববার কথা নয়?

বড় আজীব ব্যাপার যে, উনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দুআ ইবাদতের মগজ, মুসলমানদের জামাআত (?)কে ধরে থাকতে বলেছেন, তিনি ও সাহাবীগণ সূরা ফাতিহার পর আমীন বলেছেন, কুনূত ও ইস্তিস্কার দুআতে জামাআতী দুআ করেছেন এবং ফরয নামাযের পর দুআ কবুল হয় বলেছেন। **'অতএব ফরয নামাযের পর জামায়াত সহকারে দুআ কোন নতুন কাজ নয়!'**

কিন্তু যদি তা নতুন কাজ নাই হলো, তাহলে পুরনো কাজের সরাসরি একটি দলীলও তো থাকা দরকার। কোন এক বা দু'দিকের মিল থাকলেই তো জিনিস এক হয়ে যায় না। চিনি, লবন, ঘোল, দই ও চুন সাদা হলেও প্রত্যেকটি তো পৃথক পৃথক জিনিস। অতএব একটির স্বাদ প্রমাণ করতে আরেকটির উপর অনুমিতি কাজে দেবে কি?

পরিশেষে উনারা বলেন, **'জানা গেল যে, নাবী (সাঃ) ও সাহাবিদের (রাঃ) কাওলী ও ফেয়েলী (কথা ও কাজ) উভয় প্রকার হাদীস (অনুরূপ কুরআনের বহু আয়াত) দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ফরয এবং ওয়াজিব আকিদা না রেখে ফরয নামাযের পর ধারাবাহিকভাবে দুই হাত তুলে দুআ করা মোস্তাহাব ও জায়েয।'**

বাস্! গোটা বই পড়ে যা প্রমাণ হল, তা জায়েয বাস্!

এত খড়-কাঠ পুড়িয়ে শেষে আলুপোড়া।

এত বিদ্যুতের চমকানি ও গর্জনের পর শিশিরের মত বর্ষণ বাস্?

এ যেন পর্বতের মুষিক প্রসব!

কেন এত কিছুর পর তা ফরয নয়, ওয়াজেবও নয়? আল্লাহর আদেশ, রসূলের আদেশ, রসূলের ফেয়েল, সাহাবাদের ফেয়েল থাকা সত্ত্বেও তা কেবল জায়েয বাস্?

দুআ না হলে নামায (তাতে যা বলা হয়েছে) 'খিদাজ' গাবড় যাওয়ার মত হয়। 'দোয়া ত্যাগকারীকে শাস্তি দেওয়া হয়।' দুআ না করলে লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নাম যেতে হবে। দুআ না করলে বিদআতী, বিপথগামী এবং মুসলীম সমাজকে বিভ্রান্তকারী হতে হয়। দুআ না করার কারণে আল্লাহর গযবের হুমকী প্রযোজ্য হয়। দুআ না করলে আল্লাহ রাগান্বিত হন। আর সেই দুআ কেবল '**মোস্তাহাব**' ও '**জায়েয**' বাস্!

শ্রদ্ধেয় পাঠক! আপনি যদি এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকেন, আপনার মন যদি এ বিতর্কিত বিষয়কে বুঝে উঠতে না পারে, তাহলে সহজ করে এতটুক বুঝে নিন যে, সোনার বাংলার আলেমদের মধ্যে আমাদের নেতৃস্থানীয় উলামাগণের মতে ফরয নামাযের পর মুনাজাত বিদআত, যেমন সউদী আরবের সকল মুফতী তথা আল্লামা আলবানীর মতে তা বিদআত। এবারে দুই দলের মধ্যে আপনার ন্যায়পরায়ণ মনের নিক্তিতে যাঁদেরকে বেশী জ্ঞানী ও যাঁদের কথাকে অধিক বলিষ্ঠ মনে হয়, সেটির উপর আমল করুন, নাজাত পেয়ে যাবেন। আর এ কথাও জেনেছেন যে, ফরয নামাযের পর মুনাজাত বিদআত বলে আর কোন মুনাজাত বা দুআই নেই -তা নয়। বরং সঠিক ও সুন্নতী জায়গা তথা আম জায়গাতে আল্লাহর কাছে দুআ ও মুনাজাত করুন।

আপনি বুঝতেই পারছেন যে, ওঁদের মতে দুআ মোস্তাহাব; অর্থাৎ, যা করা ভালো, না করলে পাপ নেই। অথবা জায়েয; যা করা, না করা সমান। অর্থাৎ, ফরয নামাযের পর মুনাজাত ত্যাগ করলে ওঁদের মতে কোন পাপ হচ্ছে না।

পক্ষান্তরে এঁদের মতে ফরয নামাযের পর মুনাজাত যদি করেন, তাহলে তা বিদআত। অর্থাৎ, যা করলে শরীয়তের খিলাপ হতে পারে এবং তাতে পাপ হতে পারে। সুতরাং আপনি কোন্‌টি মানবেন, সেটা আপনার ব্যাপার।

মহানবী ﷺ বলেছেন, “তুমি তোমার হৃদয়ের নিকট ফতোয়া চাও, যদিও অনেক মুফতী তোমাকে ফতোয়া দিয়ে থাকে।” *(সহীহুল জামে’ ৯৪৮-নং)*

আর মহান আল্লাহ বলেন,

{فَبَشِّرْ عِبَاد، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ } (١٧-١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে - যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(সূরা যুমার ১৭-১৮)*

তৃতীয় অধ্যায়

মাগরেবের পূর্বে দুই রাকআত নামায কি বিদআত?

মহানবী ﷺ বলেন, “প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায আছে।” এইরূপ তিনবার বলার পর শেষে বললেন, “যে চাইবে তার জন্য।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৬২নং)*

তিনি আরো বলেন, “এমন কোন ফরয নামায নেই, যার পূর্বে ২ রাকআত নামায নেই।” *(ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩২, সহীহুল জামে’ ৫৭৩০নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা মাগরেবের পূর্বে নামায পড়। তোমরা মাগরেবের পূর্বে নামায পড়।” অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি বলেন, “যে চায় সে পড়বে।” এ কথা বলার কারণ, তিনি ঐ নামাযকে লোকেদের (জরুরী) সুন্নত মনে করে নেওয়াকে অপছন্দ করলেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১৬৫নং)*

আনাস ﷺ বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। মুআয্যিন যখন মাগরেবের আযান দিত, তখন লোকেরা প্রতিযোগিতার সাথে মসজিদের খাম্বাগুলোর পশ্চাতে ২ রাকআত নামায পড়তে লেগে যেত। এমনকি যদি কোন অজানা লোক এসে মসজিদে প্রবেশ করত, তাহলে এত লোকের নামায পড়া দেখে সে মনে করত, হয়তো মাগরেবের জামাআত হয়ে গেছে। (এবং ওরা পরের সুন্নত পড়ছে।) *(মুসলিম, মিশকাত ১১৮০ নং)*

মারযাদ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি উক্ববাহ আল-জুহানীর নিকট এসে বললাম, আমি কি আবূ তামীমের একটি আশ্চর্য খবর বলব না? উনি মাগরেবের নামাযের আগে ২ রাকআত নামায পড়েন! উক্ববাহ ﷺ বললেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় তা পড়তাম। আমি বললাম, তাহলে এখন আপনাকে পড়তে বাধা দেয় কিসে? তিনি বললেন, কাজ বা ব্যস্ততা। *(বুখারী, মিশকাত ১১৮১নং)*

বহু মাসায়েলের মত এ মাস্আলাতেও মতভেদ করেছেন উলামাগণ। প্রসিদ্ধ ও সহীহ হাদীসে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মনে করেন এ নামায বিদআত। তার বিভিন্ন কারণ আছে; যেমন ঃ-

১। এ নামায আল্লাহর নবী ﷺ পড়েননি।

এ নামায মহানবী ﷺ পড়েছেন বলে হাদীস বর্ণিত আছে। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৩নং)* কিন্তু মতান্তরে তা সহীহ নয়। *(তামামুল মিন্নাহ, আলবানী ২৪২পৃঃ)* বরং হযরত আনাস ﷺ বলেন, ‘আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে সূর্য ডোবার পর মাগরেবের নামাযের আগে ২ রাকআত নামায পড়তাম।’ এ কথা শুনে তাবেয়ী মুখতার বিন ফুলফুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ কি ঐ ২ রাকআত নামায পড়তেন?’ উত্তরে আনাস ﷺ বললেন, ‘তিনি আমাদেরকে তা

পড়তে দেখতেন। কিন্তু সে ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু আদেশও করতেন না এবং নিষেধও করতেন না।' *(মুসলিম, মিশকাত ১১৭৯নং)*

কিন্তু তিনি পড়েছেন কি না, তা বিতর্কিত হলেও তিনি নিঃসন্দেহে পড়তে আদেশ করেছেন এবং পড়তে দেখে নিষেধ করেননি। আর তা এ কথারই প্রমাণ যে, তা মুস্তাহাব।

আল্লামা আলবানী মিশকাতের (১/৩৭০) আনাসের হাদীসের টীকায় বলেন,

فهما مستحبتان، ونفي الأمر بهما لا يستلزم نفي المندوبية ـــ كما توهم البعض ـــ لأنها صلاة، فهي عبادة أقرها رسول الله ﷺ، فتبقى على الأصل، وهو المشروعية والاستحباب، إلا بنهي وهو منفي، بل ثبت الأمر بهما على التخيير كما تقدم، فهو يفيد المندوبية أيضاً.

'সুতরাং ঐ দুই রাকআত নামায মুস্তাহাব। (তিনি আমাদেরকে তা পড়তে দেখতেন। কিন্তু সে ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু আদেশও করতেন না) এই আদেশ না করা তা মুস্তাহাব না হওয়ার দলীল নয়; যেমন অনেকে ধারণা করে থাকেন। কারণ তা হল নামায। তা এমন একটি ইবাদত, আল্লাহর রসূল ﷺ যার স্বীকৃতি দিয়েছেন ও অনুমোদন করেছেন। সুতরাং তা মূল হিসাবে অব্যাহত থাকবে। আর মূল হল, তা বিধেয় ও মুস্তাহাব। অবশ্য নিষেধ থাকলে সে কথা ভিন্ন। বরং তার পড়া-না পড়ার ব্যাপারে এখতিয়ার প্রমাণিত হয়েছে; যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর তাও ঐ নামায মুস্তাহাব হওয়ার কথাই নির্দেশ করে।'

আল্লামা ইবনে উষাইমীন উক্ত হাদীসের টীকায় বলেন,

وهذا إقرار منه على هذه الصلاة، فثبت الفصلُ بالسُّنَّة القوليَّة والسنَّة الإقرارية.

'এ হল তাঁর তরফ থেকে মাগরেবের পূর্বে ঐ নামাযের স্বীকৃতি। সুতরাং তা দিয়ে মাগরেবের আযান ও ইকামতের মাঝে ব্যবধান উক্তিমূলক ও স্বীকৃতিমূলক উভয় সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত হল। (আল-মুমতে' ১/৫৮)

২। **খুলাফায়ে রাশেদীন - চার খলিফা ঐ দুরাকাত নামায পড়তেন না বা অভিমত পোষণ করতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলা হয়, চার খলিফার আদর্শ ও মতবাদের উপর এতেকাদ ও অনুসরণ করাই যথেষ্ট।**

শুধু চার খলীফাই কেন, সারা বিশ্বের মানুষ যদি একধার হয়ে যায় এবং আমাদের মহানবী ﷺ-এর আদর্শ যদি অন্য ধারে যায়, তাহলে সব ছেড়ে দিয়ে মহানবী ﷺ-এর আদর্শের উপর ই'তিকাদ ও তাঁর অনুসরণ করা অপরিহার্য।

মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (রাষ্ট্রনেতা ও উলামাদের) আনুগত্য কর। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ঘটে তবে সে বিষয়কে তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ফিরিয়ে দাও। এটিই তো উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়।" *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

সঙ্গে কুরবানী না থাকলে আবূ বাকর ؓ ও উমার ؓ ইফরাদ হজ্জকে উত্তম মনে করতেন। পক্ষান্তরে সহীহ সুন্নাহতে তামাত্তু হজ্জ উত্তম হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা আছে। সেই ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস ؓ তামাত্তু হজ্জ উত্তম বলে ফতোয়া দিতেন। কিন্তু কেউ কেউ আবূ বাকর ও উমারের কথা বললে তিনি বলেছিলেন, "অতি সত্বর তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ হবে। আমি বলছি, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন।' আর তোমরা বলছ, 'আবূ বাকর ও উমার বলেছেন।" *(আহমাদ ১/৩৩৭, এর সনদটি দুর্বল। অবশ্য উক্ত অর্থেই সহীহ সনদে মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাকে একটি আষার বর্ণিত হয়েছে।*

দেখুনঃ যাদুল মাআদ ২/ ১৯৫, ২০৬)

একই ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-কে এক ব্যক্তি বলল, 'আপনার আব্বা তো তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন।' এ কথা শুনে তিনি তাকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আদেশ অধিক মানার যোগ্য, নাকি আমার আব্বার?' *(যাদুল মাআদ ২/ ১৯৫)*

বাকী থাকল চার খলীফা তা পড়তেন না। তো এ ব্যাপারে মুবারকপুরী বলেন, (যয়লয়ী ইব্রাহীম নাখয়ী কর্তৃক যে হাদীস বর্ণনা করেছেন,) এ হাদীস দলীল হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ তা মু'যাল (যয়ীফ)। তাছাড়া ইব্রাহীম নাখয়ী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছাড়া কোন সাহাবীকে দেখেননি, তাহলে তিনি চার খলীফার হাল কিভাবে জানলেন? তিনি যে আষার বর্ণনা করেন, তার একটির সনদে রয়েছে পরিচয়হীন রাবী এবং অন্যটির সনদে রয়েছে ছিন্নতা। সুতরাং এ দিয়ে প্রমাণ করা যায় না যে, তাঁরা তা পছন্দ করতেন না। অবশ্য তাঁরা তা নাও পড়তে পারেন। যেহেতু তা ত্যাগ করা মুবাহ। যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন, "যে চাইবে তার জন্য।" *(দেখুনঃ তুহফাতুল আহওয়াযী)*

অতএব এ কথা প্রমাণ হয় না যে, চার খলীফা ঐ নামায পড়েননি। আর বাকী সাহাবাগণ যে পড়েছেন, তার কথা উপর্যুক্ত আনাস ও মারষাদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর তিরোধানের পরেও সাহাবী, তাবেয়ী ও সলফগণ মাগরেবের ফরয নামাযের পূর্বে ২ রাকআত ঐ নামায পড়ে গেছেন। যাঁরা পড়েননি অথবা কখনো কখনো পড়েছেন, তাঁদের জন্য তা বৈধ ছিল। যেহেতু তাতে এখতিয়ার রয়েছে। পক্ষান্তরে কেউ কেউ তা নিয়মিত পড়ে গেছেন। আবূ দারদা বলতেন, 'আমাকে চাবুক দিয়ে মারা হলেও ঐ দুই রাকআত ছাড়ব না।' যেহেতু "নামায হল শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও বিধান।"

৩। উনারা বলেন, উপরোক্ত হাদীসগুলি মানসূখ। রহিত, প্রত্যাহৃত। আর নাসেখ হাদীস হল তিনটি ঃ-

(ক) ইব্রাহীম নাখয়ী বলেন, চার খলীফা ঐ নামায পড়েননি।

(খ) ইবনে উমার বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে ঐ নামায পড়তে কাউকে দেখিনি।

(গ) বুরাইদাহ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মাগরেব ছাড়া প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায আছে।" (দারাক্বুত্বনী, বাইহাক্বী)

প্রথমতঃ এ কথা জ্ঞাতব্য যে, নাসেখ হাদীসকে শক্তিশালী হতে হবে। নাসেখ হাদীস যদি দুর্বল হয়, তাহলে তো তা সহীহ হাদীসের নাসেখ হতে পারে না।

এখন দেখা যাক, ঐ নাসেখ হাদীসগুলোর অবস্থা কি?

(ক) ইব্রাহীম নাখয়ীর আষার ধোপে টিকে না। কারণ, অজ্ঞাত-পরিচয় রাবী ও ছিন্ন সনদযুক্ত আষার দিয়ে বুখারীর মারফূ' হাদীসকে মনসূখ করা যায় না। তা ছাড়া কোন সাহাবী কোন হাদীস অনুযায়ী আমল না করলেই, তা মনসূখ হয়ে যায় না। যতক্ষণ না সাহাবী স্পষ্ট করে বলবেন যে, তা মনসূখ বা রহিত।

(খ) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত ঐ আষারও সহীহ নয়। এ ব্যাপারে ইবনে হায্‌ম বলেন,

(إنه لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا ندري من هو).

অর্থাৎ, এটি সহীহ নয়। কারণ, তা আবূ শুআইব অথবা শুআইব সূত্রে বর্ণিত। আর জানি না যে, সে কে? (অর্থাৎ, রাবী পরিচয়হীন।) (আল-মুহাল্লা ২/২৫৪, আয্‌-ষামারুল মুস্তাত্বাব, আলবানী ১/৬৩, যয়ীফ আবূ দাঊদ)

তা ছাড়া ইবনে উমার ﷺ যদি ঐ নামায পড়তে না দেখেন, তাহলে বুখারীর ঐ হাদীস মনসূখ হয়ে যায় না। বরং তিনি না দেখলেও অন্য সাহাবাগণ তো দেখেছেন; যেমন আনাসের আষারে বর্ণিত হয়েছে।

(গ) বুরাইদা ﷺ-এর হাদীসও সহীহ নয়। যেহেতু তার সনদে হাইয়ান রাবী মিথ্যুক। আর এই

জন্যই ইবনুল জাওযী এই হাদীসকে তাঁর 'মাওযূআত' গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীস সহীহ হাদীসকে মনসূখ করতে পারে না।

তাছাড়া বুখারী শরীফের ঐ সহীহ হাদীসের রাবীও খোদ বুরাইদা ﷺ-এর ছেলে আব্দুল্লাহ। আর ঐ তথাকথিত 'নাসেখ' হাদীসের রাবীও তিনি। তাহলে ঐ হাদীসে বর্ণিত 'মাগরেব ছাড়া' কথাটি শুদ্ধ হত, তাহলে তিনি এর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করতেন না।

পক্ষান্তরে খোদ বুরাইদা ও তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ মাগরেবের পূর্বে ঐ দুই রাকআত নামায পড়তেন। *(দেখুন, ফাতহুল বারী ২/৪৩২, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২ ১৩)*

আল্লামা মুবারকপুরী (রঃ) তিরমিযীর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَقَبْلَ صَلَاتِهِ وَهُوَ الْحَقُّ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ مِمَّا لَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, হাদীসটি মাগরেবের আযানের পর এবং (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ার বৈধতার দলীল। আর এটাই হল হক। পক্ষান্তরে ঐ নামায মনসূখ হওয়ার কথাটি ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়। যেহেতু সে কথার কোন দলীল নেই।

ইমাম নাওয়াবী বলেন,

وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ النَّسْخ فَهُوَ مُجَازِف ؛ لِأَنَّ النَّسْخ لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا عَجَزْنَا عَنْ التَّأْوِيل وَالْجَمْع بَيْن الْأَحَادِيث وَعَلِمْنَا التَّارِيخ ، وَلَيْسَ هُنَا شَيْء مِنْ ذَلِكَ .

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, ঐ নামায মনসূখ, সে একজন হঠকারী অবিবেচক। যেহেতু মনসূখ তখনই বলা যেতে পারে, যখন পরস্পর-বিরোধী হাদীসের ব্যাখ্যা ও তার মাঝে সামঞ্জস্য সাধন করতে অক্ষম হয়ে যাব এবং কোন্‌টি আগের ও কোন্‌টি পরের হাদীস তার ইতিহাস জানতে পারব। আর এখানে তার কিছুই নেই। *(শারহু মুসলিম ৩/১৯৬)*

হানাফী মযহাবের বিভিন্ন টীকা-টিপ্পনী থেকে মনসূখ হওয়ার মত গ্রহণ করে যদি 'হুব্বে আলী নেহী বুগযে মুআবিয়া' প্রকাশ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ছেড়ে দিন ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা, কারণ ওটাও ওঁরা মনসূখ বলেন। ছেড়ে দিন রফয়ে য়্যাদাইন, কারণ সেটাও ওঁদের মতে মনসূখ। এইভাবে বহু কিছু পাবেন যা অনেকে মনসূখ বা যয়ীফ বলেছেন অথচ তা আহলে হাদীসের নিকট আমলযোগ্য শুধু এই জন্য যে, তাঁরা বিনা কোন অন্ধপক্ষপাতিত্বে যাচাই-বাছাই করে সহীহ হাদীস দ্বারা আমল করেন।

আক্কেলের ঘোড়া ছুটিয়ে সহীহ হাদীসকে রদ্দ করার মত যখন কোন পথ পান না, তখন ওঁদের জন্য শেষপথ দুটি খোলা থাকে; এক হল তা'বীল (অপব্যাখ্যা) এবং দুই হল মনসূখ বলা। ওঁদের এক ইমাম আবুল হাসান কারখী বলেন,

كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক সেই আয়াত, যা আমাদের মযহাবপন্থীদের মযহাবের পরিপন্থী তা হয় ব্যাখ্যেয় অথবা মনসূখ (রহিত)। আর প্রত্যেক অনুরূপ হাদীসও ব্যাখ্যেয় অথবা রহিত!! *(আদ্দুর্রুল মুখতার ১/৪৫ টীকা, আল-হাদীস হুজ্জাতুন বিনাফসিহ, আলবানী ১/৮৮)*

সুতরাং যদি আপনি হাদীসপন্থী হন, তাহলে অন্ধপক্ষপাতিত্ব ছেড়ে সহীহ হাদীসের ফায়সালা শিরোধার্য করুন, তাহলেই মনের আঁধার কেটে যাবে।

৪। উনাদের কেউ বলেন, **'অন্য দিকে মাগরেবের আসল নামায লৈ হয়ে যায়।'** কেউ বলেন, **'উক্ত দুই রাকআত ঐ সময় পড়ার কারণে মাগরেবের ফরয নামায তাখির বা লেট হয়ে যায়। হযরত মা আয়েশার (রাঃ) হাদিসে (মুসলিম শরীফ তাজিলুস সালাত) মাগরেবের ফরয নামায লেট করে পড়ার ফাতওয়া নাই। বরং জলদি পড়ার কথা উল্লেখ আছে। আল্লার রাসূল রোযা খুলেছেন তাড়াতাড়ি এবং মাগরিবের নামাযও তাড়াতাড়ি পড়েছেন।'** কেউ বলেন, **'মাগরেবের**

আওয়াল অক্ত চলে যায়।'

মুবারকপুরী (রঃ) বলেন, এ কেবল একটি দাবী, যার কোন দলীল নেই। সুতরাং তা ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়। (ঐ)

ইমাম নাওয়াবী বলেন, যাঁরা বলেন যে, ঐ দুই রাকআত নামায পড়লে মাগরেব 'তাখির' হয়ে যাবে, তাঁদের খেয়াল ফাসেদ (বাজে) এবং সুন্নাহ পরিপন্থী। তাছাড়া ঐ নামায পড়ার জন্য যে সময় লাগে তা তো নেহাতই সামান্য, তাতে আওয়াল অক্ত থেকে তাখীর হয় না। *(শারহু মুসলিম ১/১৯৬)*

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, বিভিন্ন দলীলসমূহের সমষ্টি এই নির্দেশনা দেয় যে, এই নামায হাল্কা করা মুস্তাহাব, যেমন ফজরের দু' রাকআত সুন্নত হয়। *(ফাতহুল বারী ২/৪৩২)*

মাগরেবের নামাযের পর তীর পড়ার জায়গা দেখা যেতে হবে। অবশ্যই দেখা যাবে। এ নামায পড়তে বড় জোর ২/৩ মিনিট লাগে। আর তাতে কোন পার্থক্য সূচিতই হয় না। সঊদী আরবের বাইশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, মাগরেবের অক্তের ঠিক ১০ মিনিট পর ইকামত দিয়ে নামায শেষ করেও ঐরূপ ঔজ্জ্বল্য অবশিষ্ট থাকে, যাতে তীর পড়ার জায়গা দেখা যায়। কিন্তু মাগরেবের আযান দেরী করে দিলে অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে তা কি আর সম্ভব?

সঊদী আরবের ফকীহ ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেন, মাগরেবের নামায সত্বর পড়তে হবে। যেহেতু নবী ﷺ সূর্য ডোবার পরে তা পড়তে শীঘ্রতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এই শীঘ্রতার মানে এই নয় যে, আযানের পরপরই ইকামত দিতে হবে। যেহেতু নবী ﷺ মাগরেবের পূর্বে নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাহাবাগণ তা পড়েছেন। এ হল এ কথার দলীল যে, আযানের পর লোক নামাযের জন্য শীঘ্রতা করবে, কিন্তু অন্য লোকেদের ওযূ ও দু' রাকআত নামায পড়ার মত সময় দেরী করবে। (আল-মুমতে' ১/৯০)

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ঐ ওযর ঐ নামাযকে অবৈধ বা বিদআত করতে পারছে না। বুখারী-মুসলিম (সহীহায়নের) হাদীসকে রদ্দ করার মত চোরা ছিদ্রপথ ও খোঁড়া ওযর ও যুক্তি থাকছে না।

৫। **'নামাযটি সুন্না হয়ে যাবে ভেবে আশংকায় আল্লাহর রাসূল (সাঃ)এর মনে কারাহিয়্যাত হয়েছে।'**

আর তার জন্যই কি ফাকিহ লায়েস, ইমাম ফাকিহ নাখয়ী ঐ নামাযকে বিদআত বলেছেন? কক্ষনো না। তাঁদের নিকট বিপরীত হাদীস ছিল বলেই তাঁরা বিদআত বলেছেন। অথচ সে হাদীস সহীহ নয়। আর তাঁরা তো বুখারী-মুসলিম চোখেই দেখেননি। কারণ এঁরা বুখারী-মুসলিমের বহু পূর্বের ফকীহ। হয়তো বা তাঁদের নিকট ঐ সকল সহীহ হাদীস পৌঁছেনি; যেমন আমরা ইমামে আ'যম আবূ হানীফা (রঃ)এর জন্য বলে থাকি।

সুতরাং অপছন্দ ও সুন্নাহর বিপরীত মানেই বিদআত নয়। ইমাম মুহিব্ব আত্-ত্বাবারী বলেন, (তিনি ঐ নামাযকে লোকেদের 'সুন্নত' মনে করে নেওয়াকে অপছন্দ করলেন।) এই উক্তি দ্বারা নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, তা মুস্তাহাব নয়। যেহেতু এটা অসম্ভব যে, যা মুস্তাহাব নয়, তার তিনি (তিন তিনবার) আদেশ করবেন। বরং এই হাদীস ঐ দু' রাকআত নামায মুস্তাহাব হওয়ার সবচেয়ে বলিষ্ঠ দলীলসমূহের অন্যতম। তাঁর 'সুন্নত' কথার উদ্দেশ্য হল, জরুরী সুন্নত, অপরিহার্য তরীকা ও শরীয়ত। যেন তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তা ফরযের মর্যাদায় নয়। *(ফাতহুল বারী ৪/ ১৮৩)*

যেহেতু তিন তিনবার আদেশ ফরয হওয়ারই দাবী রাখে। তাঁর এই তাকীদ শুনে লোকে যেন 'জরুরী' বা 'ফরয' মনে না করে বসে, তাই শেষে ঐ উক্তি জুড়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী কি মত পোষণ করেছেন? তিনি বলেছেন,

وَأَمَّا كَوْنُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّهِمَا فَلَا يَنْفِي الِاسْتِحْبَاب ، بَلْ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ الرَّوَاتِب.

অর্থাৎ, নবী ﷺ ঐ নামায না পড়লেও তা মুস্তাহাব হওয়ার খন্ডন হয় না। বরং তা এই কথার দলীল যে, ঐ নামায সুন্নাতে রাতেবাহ বা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নয়। *(ফাতহুল বারী ২/৪৩২)*

৬। নাখয়ী, লাইস ইমাম বুখারী ইত্যাদি থেকে বড়। আর তার মানে কি বড়দের কথা মেনে নিতে হবে; যদিও তা সহীহ হাদীসের খেলাপ হয়? যেমন ওঁরা বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ও ফিকাহ আগে এসেছে এবং বুখারী-মুসলিম ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ পরে এসেছে। আর তার মানে ছোটদের হাদীস না মেনে বড়দের কথা মেনে নিতে হবে। কারণ হাদীস বড়দেরই বেশী জানার কথা।

অবশ্যই তা নয়। আবূ বাক্র বড় হলেও হাদীসে আবূ হুরাইরা বড়। আবূ বাক্রকেও আবূ হুরাইরার হাদীস মানতে হবে। প্রত্যেক বড় বড় ইমামগণ বলে গেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।' এই হিসাবে সহীহ হাদীসের মযহাব তাঁদেরই মযহাব। আর এ কথাও সত্য যে , ইমাম নাখয়ী ও আবূ হানীফার যুগে হাদীস সংগ্রহের সেই তৎপরতা শুরু হয়নি, যা পরবর্তীকালে শুরু হয়। আর তার ফলেই ঐ সকল ইমামগণ বেশী হাদীস জানতেন না এবং বহু সমস্যার সমাধান 'রায়' দ্বারা দিয়ে গেছেন।

সুতরাং ইমাম নাখয়ী ও লাইস বয়সে বড় আর তাঁরা মাগরেবের পূর্বে ঐ নামাযকে বিদআত বলেছেন এবং ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এঁরা বয়সে ছোট বলে তাঁদের কিতাবে বর্ণিত সহীহ হাদীসকে রদ্দ করে দিতে হবে - এ যুক্তি একটি বিকলপদ ও পঙ্গু যুক্তি।

ওঁরা বড় ও আগে। তার মানে কি এই যে, হাদীস পরে তৈরী করা হয়েছে। হাদীস না থাকলে ফিকাহ এল কোত্থেকে? বড়র কথা মানতে হলে তো সকলকে 'হানাফী' হওয়া দরকার। কিন্তু সবার থেকে বড় ও আগে কি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ নন?

৭। **'ইমাম জাউযী সমস্ত মাউযু হাদীসগুলি এক স্থানে জমা করে তা হাদিস আকারে প্রকাশ করে তার নাম দিয়েছেন মাউযুআতে ইমাম জাউযী। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফালের ঐ হাদিসটি মাউযুআতে ইমাম জাউযীতে স্থান দিয়েছেন, কেন? অয়াল্লাহো আলামো।'**

তার মানে তাহলে মাগরেবের পূর্বে ঐ দু' রাকআত নামাযের হাদীসটি মাউযু বৈকি? ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেঊন।

وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم

আসলে তুহফাতুল আহওয়াযীতে রয়েছে,

قَالَ وَكَانَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِب رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَة حُسَيْن الْمُعَلِّم عَنْ عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِب رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فِي الثَّالِثَة لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحه انْتَهَى . وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْحَدِيث فِي الْمَوْضُوعَات وَنَقَلَ عَنْ الْفَلَّاس أَنَّهُ قَالَ كَانَ حَيَّانُ هَذَا كَذَّابًا.

এখানে বুরাইদার নাসেখ হাদীসের জন্যই বলা হয়েছে, ('সাওয়াল মাগরেবে'র হাদীসকে) ইবনুল জাউযী 'মাউযূআত'-এ উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তার সনদে ঐ হাইয়ান নামক রাবী রয়েছে, যে মিথ্যুক। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। (দেখুন ঃ আল-মাউযূআত, ইবনুল জাউযী ২/৯২, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১/৩৬)

কিন্তু যেহেতু আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফালের হাদীস উল্লেখ করার পর ঐ কথা বলা হয়েছে এবং মনে মনে উক্ত হাদীসের প্রতি অনীহা রয়েছে, তাই মনে হয়েছে যে, বুখারীর হাদীসটিই 'মাউযূআত'-এ স্থান পেয়েছে। দেখুন! এইভাবে ভুল বুঝে মানুষ কত বড় সর্বনাশ করে!

নসীহাতান এখানে একটি আম হাদীস উলামাগণের জন্য পেশ করছি ঃ-

قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَيُّمَا طَبِيب تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُــوَ ضَــامِنٌ.
أخرجه أبو داود (٤٥٨٦) و النسائي (٢ / ٢٥٠) و ابن ماجه (٣٤٦٦) والدارقطني (ص ٣٧٠) و الحاكم (٤ / ٢١٢) و البيهقي (١٤١)

৮। **'ফরয নামায ছাড়া, অন্য নামায বাড়িতেই উত্তম, এর সাদ আলাদা হাদিসে বলা হয়েছে, মাগরেবের আগের ঐ নামায রিয়া হচ্ছে বা শির্‌ক্‌।'**

ফরয ছাড়া অন্য নামায বাড়িতে পড়া উত্তম। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে অন্য নামায মসজিদে তো পড়ছে। তাতেও কি রিয়া বা শির্ক হচ্ছে? মাগরেবের পরের সুন্নত মসজিদে পড়লে যদি শির্ক না হয়, তাহলে পূর্বের ঐ দু' রাকআত শির্ক হবে কেন? তাছাড়া নামাযের রিয়া বা শির্ক তো মনের ব্যাপার। আর তা তো ফরয নামাযেও হতে পারে। তাই নয় কি?

৯। **'ঐ নামাযটা পড়তে খুশূ-খুযূ থাকে না।'**

খুশূ-খুযূও মনের জিনিস; তা আনতে হয়। আসলে কিছু লোক ঐ নামায পড়া হাঁ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে, আর তার জন্যই যে পড়ে, সে তাড়াতাড়ি পড়ে এবং তাতেই মনে হয় রিয়া হচ্ছে। কিন্তু যথেষ্ট (২/৩ মিনিট) সময় নিয়ে নামাযটি পড়লে অন্য সুন্নতে যেমন খুশূ-খুযূ হয় তাতেও হবে। তবে ফজরের সুন্নাতে মুআক্কাদার মত এ সুন্নত হাল্কা হবে; যেমন উলামাগণ বলেছেন। প্রত্যেক হাজী সাহেব জানেন, সঊদী আরবে মাগরেবের আযানের পর ৫-১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়। অবশ্য এখানে আযান হয় পূর্ণ সময়ানুবর্তিতার সাথে।

১০। **'উক্ত দোয়াকে বিদাত বলার মতই, এই নামাযকে বিদাত বলে অভিহিত করেছেন।'**

ঐ নামায ও ফরয নামাযের পর মুনাজাত এক নয়। কারণ ঐ নামাযের ভিত্তি আছে; কিন্তু ঐ মুনাজাতের কোন ভিত্তি নেই। ওটার সাথে এটার কোন সাদৃশ্য নেই। আর তার মানে এই নয় যে, ওটা বিদআত হলে এটা বিদআত হবে এবং এটা বিদআত হলে ওটা বিদআত হবে।

১১। **'বর্তমানে ঐ নামাযের বয়স কম।'**

তা ঠিকই বলেছেন। আমার সোনার বাংলার আলেমগণ তা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন বলেই তো। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে তার বয়স কম নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগ থেকেই তা চলে আসছে। সঊদী আরবে এসে হাজীগণ ফিরে গিয়ে ঐ আমল আমাদের দেশে প্রচার করেন। যেমন সঊদী আরবে পঞ্চ-মুনাজাত হয় না বলে হাজীগণই সেখানে প্রচার করলে উলামাগণ ধীরে ধীরে তার তাহক্বীক্ব করেন। আর তারপর অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, বিনয়ী ও উদারপন্থী উলামাগণ মেনে নেন এবং গোঁড়াপন্থীগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন।

একদিন এক মসজিদে এক জাঁদরেল হাজী ও জাঁদরেল আলেমের মাঝে তর্ক হয়। নামায শেষে মুনাজাতের পর হাজী সাহেব বলেন, সঊদী আরবে দেখে এলাম, সেখানে মুনাজাত নাই। আপনারা কোথায় পেলেন? তা শুনে হযরত বললেন, সঊদী আরবে কুকুর নাই, তাহলে কুকুর মেরে বেড়ান গা !!! এই তো অবস্থা।

إذا صار الرجال لا يقدرون الرجال.

১২। **'ফরয নামায যা তা পড়তেই সময় পায় না, তাতে আবার আরেকটা ভারি ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। ঐ সময়ে ঐ নামায না পড়ে, প্রসঙ্গতঃ বলি, মাগরেবের নামায পড়ার পর সালাতুল আউওয়াবিন আছে, তা লম্বা সময় নিয়ে পড়তে পারে। তাতে অনেক নেকী। তা ৬ রাকআত থেকে ২০ রাকআত। ৬ রাকআত পড়লে জান্নাতে ঘর বানানো হয়। বারো বছরের নেকী লেখা হয়। অনেক সাহাবী অনেক তাবেয়ী ঐ নামায পড়েছেন। অমুক অমুক সহ কানপুরী সাহেবও ঐ নামায পড়তেন --- তা মামুল ছিলো ও আছে বলেই তো?'**

ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেঊন!

আওয়াবীনের নামায আসলে চাশ্তের নামাযের অপর নাম। মহানবী ﷺ বলেন, "চাশ্তের নামায

হল আওয়াবীনের নামায।" *(সহীহুল জামে' ৩৮২৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭০৩, ১১৬৪, ১৯৯৪ নং)*

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ)

অর্থাৎ, আওয়াবীনের (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের) নামায যখন উটের বাচ্চার পা বালিতে গরম অনুভব করে।" *(আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত ১৩১২নং)*

আর এ সকল হাদীস এ কথারই দলীল যে, মাগরেবের পর উক্ত নামের নামাযটি ভিত্তিহীন ও বিদআত। যেমন এই নামাযের খেয়ালী উপকার বর্ণনায় বলা হয়ে থাকে যে, সৃষ্টিজগৎ ঐ নামাযীর অনুগত হয়ে যায় এবং ১২ বছরের কবুল হওয়া ইবাদতের সওয়াব লিখা হয়।

যে হাদীসে মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ের নামাযকে আওয়াবীনের নামায বলা হয়েছে, তা সহীহ নয়; যয়ীফ। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪৬১৭, যয়ীফুল জামে' ৫৬৭৬নং)*

তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে যে ৬ রাকআত নামায মাগরেবের পর পড়লে ১২ বছর ইবাদতের সমান হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা সহীহ নয়। বরং তা খুবই দুর্বল হাদীস। *(যয়ীফ তিরমিযী ৬৬, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪৬৯, যজাঃ ৫৬৬১নং)* যেমন ৫০ বছরের গোনাহ মাফ হওয়ার হাদীসও দুর্বল। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪৬৮, যয়ীফুল জামে' ৫৬৬৫নং)*

তদনুরূপ এই সময়ে ২০ রাকআত নামাযে বেহেশ্তে একটি গৃহ লাভের হাদীসটিও জাল ও মনগড়া। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪৬৭, যয়ীফুল জামে' ৫৬৬২নং)*

অবশ্য সাধারণভাবে নফল নামায যেমন নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময়ে পড়া যায়, তেমনি মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণ নফল অনির্দিষ্টভাবে পড়া যায়। মহানবী ﷺ এই সময়ে নফল নামায পড়তেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। *(সহীহুল জামে' ৪৯৬২নং)*

বুঝতেই পারছেন, জ্ঞান ও বিশুদ্ধ জ্ঞান এক জিনিস নয়। হাদীস আর সহীহ হাদীস এক জিনিস নয়। সুতরাং যদি আপনার তা তমীয করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে অন্ততঃপক্ষে 'তাআব্বাত্বা শার্রান'-এর মত হবেন না। নচেৎ বিপরীত বুঝলে ও বুঝালে তো বিপদ স্বাভাবিক।

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানী পাঠক! মতভেদ স্বাভাবিক। উলামাদের মতভেদে আপনি বিচলিত হবেন না। আল্লাহ আপনাকে জ্ঞান দিয়েছেন। সেই জ্ঞানকে কাজে লাগান। এ পুস্তিকা পড়ার পর আপনি দুটি মতের মধ্যে একটি গ্রহণ করুন; যেটাকে আপনি বলিষ্ঠ মনে করেন। আপনার সময়, সুযোগ ও ইচ্ছা হলে মাগরেবের ফরয নামাযের আগে ঐ নামায পড়ুন; যদিও তার নির্দিষ্ট ফযীলত হাদীসে আসেনি। তবুও তা নামায তো। নফল নামাযের ফযীলত কারো অজানা নয়। আর হ্যাঁ, গোঁড়ামি করবেন না। কারণ গোঁড়ামি অজ্ঞতার পরিচয়।

هذا و {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.